হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা

শাহরিয়ার কবির

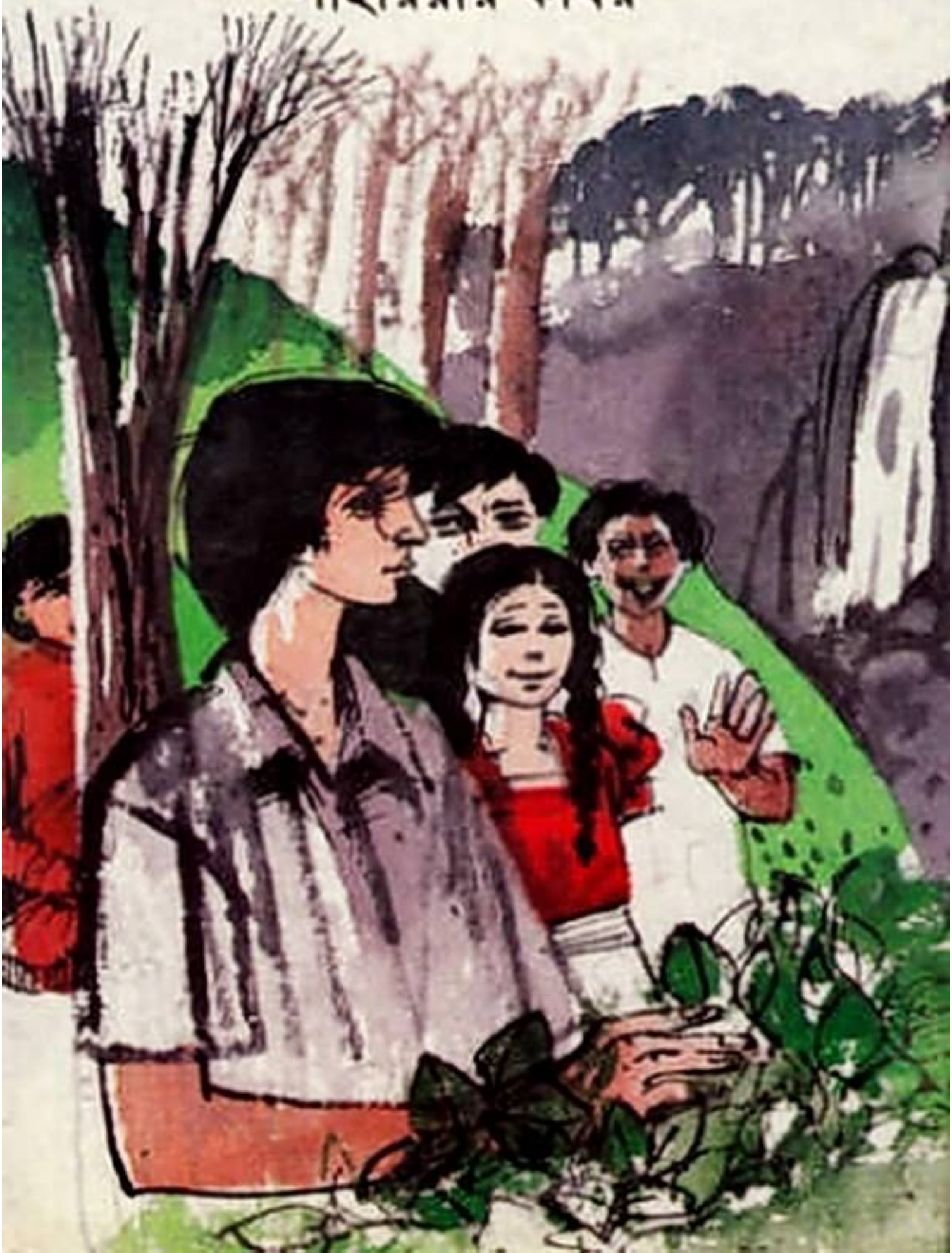

হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা

আবু-সোনিয়া
রামু
বিজু

অলংকরণ : হাশেম খান

হারিয়ে যাওয়ার সময়

অক্টোবরের মাঝামাঝি আমাদের স্কুলের বছর-শেষের পরীক্ষাটি হয়ে গেলো। ফলও বেরিয়ে গেলো দিন-পনের পরে। আমাদের সাধু নিকোলাসের স্কুলে পড়াশোনা এত তাড়াতাড়ি হয় যে, ছ'মাসের মাথায় ক্লাসের সব বই পড়া শেষ হয়ে যায়। পরের বার শেষ করতে দু'মাসের বেশি সময় লাগে না। তাই প্রত্যেক বছর অক্টোবরে ক্লাস শেষ করে আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। নবেম্বর, ডিসেম্বর দু'মাস একটানা ছুটি। জাফলং-এর হাড়কাঁপানো শীতের ভেতর ছুটির মাস দুটো ছোট-বড় এতসব ঝলমলে ঘটনায় ভরা থাকে যে, নতুন ক্লাসে উঠে সে-সব গল্প শেষ করতে জানুয়ারি মাস পেরিয়ে যায়। গত বছর বড়দিনের ছুটিতে বিজুকে ছেলেধরার দল ধরে নিয়ে গিয়েছিলো। স্কুলের সবাইকে সেই গল্প বলে শেষ করতে পুরো তিন মাস লেগেছে।

সেবার পরীক্ষার ফল বেরোবার দিন আমি, রামু আর বিজু বহুক্ষণ স্কুলের গির্জার সিঁড়িতে বসে গল্প করছিলাম। পরীক্ষার ফল দেখে আমরা এতটুকু উত্তেজিত হইনি। রামু ফার্স্ট হয়েছে; আমি আর বিজু সেকেন্ড। আমি আর রামু এবার ক্লাস নাইনে উঠেছি, বিজু সেভেনে। যেদিন থেকে আমরা তিনজন সাধু নিকোলাসের স্কুলে ভর্তি হয়েছি, তারপর থেকে প্রত্যেকটা পরীক্ষায় রামু ফার্স্ট আর আমি সেকেন্ড হয়েছি। গত চারবছর ধরে বিজু সব সময় সেকেন্ড হয়েছে। আগে স্কুলের টিচাররা আর বাড়ির বড়রা এ নিয়ে খুব হাসাহাসি করতেন। আজকাল ওঁরাও ধরে নিয়েছেন, সাধু নিকোলাসের স্কুলে আমরা যতদিন পড়ব, এতদিন এমনটি চলতেই থাকবে। ওঁদের মতো আমরাও এখন আর অবাক হই না। আমাদের হেডমাস্টার ব্রাদার এন্ডারসন যখন ক্লাসে এসে বলেন, 'এবার এ্যানুয়াল পরীক্ষায় তোমাদের ক্লাসে ফার্স্ট হইয়াছে'— তখন নাম বলার আগেই রামু দম দেয়া পুতুলের মতো উঠে দাঁড়ায়। তবে ব্রাদার এন্ডারসন এখনো রিপোর্ট কার্ডটি হাতে তুলে দিয়ে, রামু আর আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার সময় মুখ টিপে হাসবেন। থার্ড হবার জন্যে খালেদ আর পরেশের সে কী ব্যস্ততা! আমার তাতে

বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। ওরাও থার্ডের বেশি হতে চায় বলে মনে হয় না।

কালো পাথরে বাঁধানো সাধু নিকোলাসের গির্জার ঠাণ্ডা সিঁড়ির ওপর আমরা তিনজন বহুক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম। রামু আপন মনে পাহাড়ি নেপিয়ার ঘাসের গোড়ার নরম দিকটা চিবোচ্ছিলো। প্যাট্রিকের কাছ থেকে আমি 'সুইস ফ্যামিলি রবিনসন' বইটা নিয়েছিলাম পড়ার জন্যে। কয়েক পাতা পড়ে ভাঁজ করে রেখে দিয়েছি। এর আগে ওটা আমি তিনবার পড়েছি। আজকাল এসব পড়তে আর ভালো লাগে না। বিজু একটু দূরে বসে বেতফল খাচ্ছিলো। কিছু গেলার সময় বিজুর হুঁশ থাকে না। আশেপাশে কেউ আছে কি না, থাকলে তাদেরও কিছু দেয়া উচিত কি না; এসব কথা কখনো ওর মাথায় ঢুকবে না। অথচ আমরা কোনো খাবার জিনিস কিনলে ও এমন জুলজুল চোখে তাকাবে যে, পেটে অসুখ করার ভয়ে তাড়াতাড়ি ওকে একভাগ দিয়ে বাঁচি।

রামুর দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখি কী যেন গভীরভাবে ভাবছে ও। নেপিয়ার ঘাসের গোড়াটা আপন মনে খেয়ে চলেছে। আমার কাছে বেতফল থাকলে নিশ্চয়ই ওকে কটা খেতে দিতাম। বিজুটা নিতান্তই স্বার্থপর। আমাদের বাড়ির ঝি পচার মাও বলে, 'বিজুদাদা কী স্বার্থপর! কাউকে কিছু দিতে জানে না।' আমি আর রামু কিছু খেলে পচাকেও খেতে দেই।

লম্বা নেপিয়ার ঘাসের ডগা পর্যন্ত চিবিয়ে খেয়ে রামু বললো, 'দূর ছাই কিছু ভালো লাগে না। সবকিছু কী রকম একঘেয়ে হয়ে গেছে, দেখেছিস আবু?'

আমি বললাম, 'কোন্‌টা একঘেয়ে, পরীক্ষায় এরকম ফার্স্ট-সেকেন্ড হওয়া?'

'সব কিছু।' রামু বিরক্ত হয়ে বললো, 'ক্লাস, পরীক্ষা, ছুটি কিছুই ভালে লাগে না।'

বিজু বেতফলগুলো শেষ করে জামার হাতায় মুখ মুছে আমাদের পাশে এসে বসলো।

আমি আস্তে আস্তে রামুকে বললাম, 'দুমাস ছুটি কীভাবে কাটাবি কিছু ভেবেছিস?'

রামু বললো, 'এতক্ষণ ধরে সেটাই তো ভাবছিলাম। এতবড় একটা বন্ধ অথচ কিছুই করবো না, ভাবতেই আমার হাত-পা সব হিম হয়ে যাচ্ছে।'

স্কুল ছুটি হওয়ার আগে, কী করে সময় কাটাবো এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। বিশেষ করে পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে বসলেই এসব চিন্তাভাবনা মাথার ভেতর গিজ-গিজ করে। ভূগোল বইয়ে শীতে পত্রঝরা বৃক্ষের অরণ্য অঞ্চল কিংবা স্তেপের তৃণভূমির কথা পড়তে গিয়ে কতবার সেই পাতা ঝরার বনে আর মানুষ সমান লম্বা ঘাসের সমুদ্রে হারিয়ে গেছি। যে-সব গল্পের বইয়ের চরিত্র পথ হারিয়ে অচেনা কোনো জায়গায় চলে যায় সে-সব বই পড়তে আমার বেশি ভালো লাগে। কতবার আর্কাদি গাইদারের 'ইশকুল' পড়েছি, তবু ওটা পুরোনো

মনে হয় না। ফিসফিস করে রামুকে বললাম, 'কোথাও হারিয়ে যেতে পারলে বেশ হতো।'

'কী বললি?' রামু ভুরু কুঁচকে আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে বলতে হলো, 'কিছু না।'

আমার অনেক কথা নিয়ে রামু হাসাহাসি করে বলে ওকে সবসময় সবকথা বলতে পারি না। রামু আবার বলল, 'কোথায় যেন যাবার কথা বললি?'

আমি চুপ করে রইলাম। বিজু বললো, 'চল, যেদিকে দু'চোখ যায় বেরিয়ে পড়ি।'

বিজু মাঝেমাঝে এত পাকা কথা বলে যে আমিও অবাক হয়ে যাই। রামু অবশ্য বিজুর কথা শুনেই খেঁকিয়ে উঠলো, 'বললেই হল বেরিয়ে পড়ি! মার কানে একবার যাক, তারপর দেখিস কান দুটো আর মাথার সঙ্গে থাকবে না।'

বিজু মুখ কালো করে করুণ গলায় বললো, 'বারে মাকে কেন বলতে হবে!'

আমিও রামুর ওপর বিরক্ত হয়ে বললাম, 'বিজু না হয় একটা কথা বলেছে। তুই নিজেও তো আজেবাজে কথা কম বলিস না। অন্তুর সঙ্গে সেদিন তুই কী করেছিস সে কথা বললে জেঠু তোর কান দুটো খুলে নিয়ে টেমির গলায় ঝুলিয়ে দেবে।'

রামু গাঁইগুঁই করে বললো, 'তুই আবার আমার সঙ্গে লাগতে এলি কেন? তোকে তো কিছু বলি নি!'

'তুই আমাদের সব কথা বাড়িতে বলতে যাবি কেন?'

'বারে, আমি কি সত্যি সত্যি বলতে যাচ্ছি নাকি!'

রামুর গলায় এতটুকু তেজ নেই। সুযোগ পেয়ে ওকে বলে দিলাম, 'কথাটা সব সময় মনে রাখলেই খুশি হব।'

সাধু নিকোলাসের গির্জায় ঢংঢং করে বারোটার ঘন্টা বাজলো। আমি মনে মনে হিসেব করে দেখলাম, এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট হলো আমরা গির্জার সিঁড়িতে বসে আছি। বিজু একবার বললো, 'ঘরে যাবি না?' আমরা ওর কথার জবাব না দিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম।

মাঝেমাঝে আমাদের এরকম হয়। যখন কারো কোনো কথা বলার থাকে না; শুধু চুপচাপ বসে থাকি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের চিন্তাভাবনাগুলো কতরকম ডালপালা মেলতে শুরু করে। রামু আমার মেজ জ্যাঠার ছেলে আর বিজু হল সেজ কাকার ছেলে। আমরা তিনজন সবসময় একসঙ্গে থাকি বলে ছোটকা আমাদের বলে 'থ্রি মাস্কেটিয়ার্স'। এই নামে যে একটা বই আছে আমি জানি, তবে এখনো পড়ি নি। ছোটকা বলেছেন ঢাকা থেকে এনে দেবেন। আমাদের তিনজনের দলটা আরো ভারি হোক এটা আমরা কখনো চাই নি। বিজুকে যদি কখনো পেয়ারা খাওয়ার জন্যে দিগন্তের সঙ্গে ভাব জমাতে দেখেছি, তখন আমি

আর রামু ওকে কোরাসে বকে দিয়েছি। তেমনি একদিন রামু দেখেছিলো বই দেয়ার জন্যে আমি প্যাট্রিকের সঙ্গে হেসে দুটো কথা বলেছি, অমনি ওর মুখখানা হাঁড়ির মতো কালো হয়ে গেছে। আমি মাঝে মাঝে অন্তুর কথা বলে রামুকে চুপসে দেই। বাড়িতে মা আর জেঠিমা, কাকিমারা বলেন, 'হ্যাঁরে তোদের কোনো বন্ধু নেই?' আমরা তিনজন তখন গম্ভীর হয়ে যাই। রামু, বিজু কী চায় জানি না, আমি কিন্তু চাই আর একজন অন্তত আমার বন্ধু হোক। শুধু আমার নিজের, অন্য কারো নয়। কতদিন ভেবেছি সোনিয়ার সঙ্গে ভাব করবো, রামুদের জন্যে হয়ে ওঠে নি।

সোনিয়া আমাদের হাসি খালার ছোট মেয়ে। ওঁরা যখন নতুন এলেন তখন আমরা তিনজনই সোনিয়াকে দেখেছিলাম। গোলগাল পুতুল পুতুল চেহারা, চোখে চশমা আর মাথার দুপাশে লাল রিবন বাঁধা দুটো বেণি ঝোলানো। প্রথম দিকে ওর নাম জানতাম না বলে দুইবেণি ডাকতাম। সোনিয়ার বড় একটা ভাই আছে। অনেক বড়। কানাডায় কী যে পড়তে গেছে। হাসি খালা সব সময় অসম্ভরকম গম্ভীর থাকেন বলে তাঁর বাসায় ঢোকার সাহস এখনো পাই নি। রামু বলে দুইবেণির মার মতো সুন্দরী মহিলা ও জন্মেও দেখে নি।

একদিন সেজ কাকিমা রামুকে এ নিয়ে কী লজ্জায়ই না ফেলেছিলেন! রামু সেদিন সোনা হেন মুখ করে সেজ কাকিমাকে এসে বললো, 'সেজ কাকিমা, দুইবেণির মা তোমাকে যেতে বলেছে।' আমি ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকালাম এই ভেবে, দুইবেণির মার সঙ্গে রামুর আলাপ হল কবে? সেজ কাকিমা অবাক হয়ে বললেন, 'দুইবেণির মা কে রে?' রামু বলল, 'সেদিন তুমি যাকে আমলকির আচার পাঠালে!' অমনি সেজ কাকিমা হেসে খুন— 'দুইবেণি কি রে? ওতো হাসি'পার মেয়ে সোনিয়া। ওঁকে তোমরা হাসি খালা ডাকবে। দুইবেণির মা বলে কি কোনো ভদ্রমহিলাকে ডাকা যায়?'

এরপর রামু গাঁকগাঁক করে কী বললো শুনতে পাইনি। সেজ কাকিমাও বাড়ির মেয়ে-মহলে কথাটা ভালোমতেই ছড়িয়েছিলেন। তবে আমার সঙ্গে যে সোনিয়ার দুদিন কথা হয়েছে আর একদিন ও আমাকে দেখে মুখ টিপে হেসেছে, এ-কথা আমি কাউকে বলি নি। আমি রামুর মতো বোকা নই। রামু যদি কখনো অপ্রস্তুত হয়, তখন ওর মুখটা যা বোকা দেখায়—আমি হাসি চাপতে পারি না। আড়চোখে রামুর দিকে তাকিয়ে দেখি ও আবার নেপিয়ার ঘাসের গোড়া চিবোনো শুরু করেছে। আমি বললাম, 'ঘাসে বুঝি খুব ভিটামিন আছে রামু?'

রামু কিছু খেতে বসলে ভিটামিনের হিসেব করে। আমার কথা শুনে ঘাস চিবোনো বন্ধ করলো। অর্ধেক খাওয়া লম্বা ঘাসটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে হেসে বললো, 'কী করবো বল্! তুই তো সারাদিন বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে যাচ্ছেতাই সব বাংলা উপন্যাস পড়ে দু'মাস কাটিয়ে দিতে পারবি। পাজি বিজুটা

ডিটেকটিভ বই আর খাবার কিছু পেলে সবকিছু ভুলে যাবে। শুধু আমি পরীক্ষার পরদিন থেকেই ভেবে মরছি কীভাবে সময় কাটাবো।'

আমি হেসে বললাম, 'তুই পরীক্ষা দিয়ে ভাবছিস আর আমি ভাবছি পরীক্ষা দেয়ার আগে থেকে। যে-জন্যে তুই ফার্স্ট হতে পারলি। আমি ভাবছি না তোকে কে বললে?'

'এদ্দিন ধরে ভেবেও কোনো কুলকিনারা পেলি না?'

'তুই তো তখন বিজুর কথার কোনো পাত্তাই দিলি না। আমারও মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় কোথাও হারিয়ে যাই।'

'ওরকম ইচ্ছে তো সবারই হয়।' রামু বললো, 'শুধু ইচ্ছে হলেই তো হল না। হারিয়ে যাওয়ার মতো একটা ঠিকানা তো থাকতে হবে।'

বিজু হেসে বললো, 'ঠিকানাই যদি জানবি তাহলে হারাবি কী করে? ঠিকানা জেনে কি কখনো হারানো যায়? নাকি হারিয়ে যাওয়ার কোনো ঠিকানা থাকে?'

আমাদের তিনজনের ভেতর রামু বেশি বাস্তববাদী। একথা ওকে যদিও কখনো বলি নি, তবে মনে মনে সেটা মানতে বাধ্য। রামু বললো, 'ওরে হাঁদা, আমি কী বলছি সেটা তুই বুঝতে পারছিস না। কোথায় গিয়ে তুই পথ হারাতে চাস, জয়ন্তিয়া পাহাড়ে, না পিয়াইন নদীতে, সেটাও তো তোকে ঠিক করতে হবে। নাকি তুই বাড়ি থেকে বেরিয়ে উত্তর-দক্ষিণে যে-কোনো একদিকে হাঁটতে চাস, চোখ যেদিকে যায়? আমি বাপু অত বেশি এ্যাডভেঞ্চার যেতে রাজি নই।'

আমি বললাম, 'যেতে রাজি থাকলেই বা কী! দুদিন পরে বিশ্বাস দারোগা ঠিকই কান ধরে হিড় হিড় করে বাড়িতে এনে তুলবে।'

বিজু বললো, 'যাই বলিস, জাফলং জায়গাটা এমন অদ্ভুত যে, কেবল হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।'

আমি হেসে বললাম, 'সেইসঙ্গে আমাদের বয়সটাও যে এমনই—সবসময় কেবল হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।'

রামু আর বিজু একসঙ্গে হেসে উঠলো। রামু বলল, 'আসলে আমাদের এই বয়সটা নিয়েই যত গণ্ডগোল। হাবুল, মন্টুদের দেখ, মেয়েদের সঙ্গে দিব্যি এক্কাদোক্কা আর লুডু খেলে কী চমৎকার সময় কাটিয়ে দিচ্ছে। ঝন্টুদা ছোড়দারা নাটক করবে—সেখানে আমাদের নাক গলানো বারণ। আমরা কোথায় যাই বল্ তো?'

আমি বললাম, 'ভাবিস না রামু। আজ রাতের ভেতরই আমরা একটা কিছু ভেবে ঠিক করে ফেলবো। কাল থেকে কাজ শুরু করবো। কোথাও যেতে না পাই, বর্ডারে শহীদ মামাকে বলে পায়ে হেঁটে চেরাপুঞ্জির পাহাড় থেকে তো ঘুরে আসতে পারি!'

অনেক ভেবে দেখলাম, হারিয়ে যাওয়ার জন্যে জাফলং-এর চেয়ে ভালো

জায়গা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। কেন অযথা পাতাঝরা বন আর স্তেপের ঘাসের কথা ভাবি। আমাদের বাড়ি থেকে উত্তরে মেঘের মতো জয়ন্তিয়া পাহাড় দেখা যায়। সেখানে আর কদিন পর সেগুন, তেলসুর আর বুনো নাশপাতির পাতাঝরা শুরু হয় যাবে। ঘাসের জন্যে জয়ন্তিয়া পাহাড়ে যেতে হবে না। আমাদের জাফলং-এ পাহাড়ি নেপিয়ার ঘাসের বনে শীতকালে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। খাসিয়া ছেলেমেয়েরাই সেই আগুনে বুনো খরগোশ পুড়িয়ে খায়।

আমি রামুদের চেরাপুঞ্জির কথা বলেছি, যেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়। পাহাড়ি পথ ধরে গেলে মনে হয় জাফলং থেকে চেরাপুঞ্জি পনের-বিশ মাইলের বেশি হবে না। চেরাপুঞ্জির পাহাড়ে সবসময় মেঘ জমে থাকে। আমাদের বাড়ির ছাদে উঠলে সব ছবির মতো দেখা যায়।

রামু বলল, 'তুই এতক্ষণে একটা ভালো কথা বলেছিস আবু। হারাবার কোনো ঠিকানা না পেলে চেরাপুঞ্জিই যাবো।'

বিজু বলল, 'এবার তাহলে বাড়ি চল্। আমার ক্ষিদে পেয়েছে।'

আমি রামুর দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসলাম। রামু হেসে একবার বিজুর দিকে, তারপর আকাশের দিকে তাকালো। বিজু রেগেমেগে উঠে গেলো।

নুড়ি-ছড়ানো সরু পাহাড়ী পথে হাঁটতে হাঁটতে আমরা হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানার কথা ভাবছিলাম। এটা ঠিক যে এ বয়সের সব ছেলেরই ইচ্ছে করে কোথাও হারিয়ে যেতে। তবে হারিয়ে যাওয়ার সত্যিকারের ঠিকানা সম্পর্কে যে আমাদের কোনো ধারণা ছিল না, সেটা বিকেলের আগে কেউ বুঝতে পারি নি।

জয়ন্তিয়া পাহাড়ের আগন্তুক

বাড়ি ফিরতেই মেজ জেঠিমা আমাদের বকুনি দিলেন। ক্লাশ নেই অথচ আমরা দেরি করে ফিরেছি, এতে নাকি আমাদের মহা অন্যায় হয়ে গেছে। জেঠিমা একবার বকতে শুরু করলে থামতে চান না। আমি বললাম, 'জেঠিমা, রামু ফার্স্ট হয়েছে।'

'তাতে কি আমার মাথা কিনে ফেলেছে! ইশকুলে থাকতে ওর বাপ দুবার

ডবল প্রমোশন পেয়েছিলো। ওকি একবারও পেয়েছে? বংশের নাম ডোবাবে এই ছেলে।' এই বলে মেজ জেঠিমা রামুর কান ধরার জন্য হাত বাড়ালেন।

এমন সময় সেজ কাকিমা এসে বললেন, 'সং-এর মতো সবাই ওখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন? দয়া করে চাট্টি খেয়ে আমাকে উদ্ধার করো। কতক্ষণ তোমাদের খাবার নিয়ে বসে থাকবো!'

জেঠিমা যখন বকেন, তখন এভাবেই মা-কাকিমারা এসে আমাদের উদ্ধার করেন। মেজ জ্যাঠা মারা যাওয়ার পর থেকে জেঠিমা গোটা পৃথিবীটার ওপর চটে আছেন। তাঁর বকুনি থকে আজরাইলও রক্ষা পান না। তাঁর ধারণা এই ফেরেশতাটি নিশ্চয়ই অন্ধ, নইলে তাঁকে কেন এই যন্ত্রণার সংসারে এভাবে ফেলে রেখেছেন। দিদা মাঝে মাঝে আদর করে জেঠিমাকে বলেন, 'ছি মা, আজরাইল হলেন ফেরেশতা। ওঁদের কি এভাবে বলতে আছে? তোমার চেয়ে আমার জ্বালা কি কম!' এ-বাড়িতে একমাত্র দিদাই জেঠিমাকে শান্ত করতে পারেন। দিদাকে বাবা, বড় জেঠু, দাদু সবাই ভয় পান।

আমাদের খাওয়ার সময় দিদা এসে তদারকি করলেন। আমরা যে ফার্স্ট সেকেন্ড হব এটা বাড়ির সবাই আগে থেকেই জানতো। তবু দিদা সেজ কাকিমাকে বললেন, 'সেজ বৌমা আজ ওদের পাশের খবর বেরিয়েছে। মাছের মুড়োটা ওদের তিনজনকে ভাগ করে দাও। তিন টুকরো ভাজা মাছও দিও।'

সেজ কাকিমা বললেন, 'মাছ ভাজা তো ওবেলার জন্যে তুলে রেখেছি মা, এবেলা সবাই রান্না খেয়েছে।'

দিদা একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'রোজ তো ওদের ভালো-মন্দ দিতে পারি না বৌমা। উঠতি বয়েসের ছেলেদের খাওয়ার দিকে একটু বেশি খেয়াল রাখতে হয়। রাতে না হয় আমাকে কম দিও।'

এ বাড়ির তিনটি উঠতি বয়সের ছেলেকে দিদা একটু বেশি প্রশ্রয় দেন। আমরা পরীক্ষায় ভালো করি বলে দিদার কাছে সাতখুন মাপ। বিজু বললো, 'দেখ না দিদা, মা আমাকে সবসময় বলে এত খাইখাই কেন।'

দিদা হেসে বিজুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'জালের আলমারিতে তোদের জন্যে পায়েস রেখেছি। তোরা তো নলেন গুড়ের পায়েস পছন্দ করিস!'

দুপুরে খাওয়াটা একটু বেশিমাত্রায় হয়েছিলো। খেয়ে উঠে আমরা আমাদের চিলেকোঠার ঘরের মস্ত বড় খাটটায় কিছুক্ষণ গড়িয়ে নিলাম।

আমাদের 'নয়নতারা কুটির' জাফলং-এর সবচেয়ে পুরোনো আর বড় বাড়ি। আগে ছিলো এটা জমিদারদের বাড়ি। দাদু আমাদের শিলং-এর বাড়ির সঙ্গে এটা বদল করেছিলেন। দাদু পাহাড়ে থাকতে ভালোবাসেন। সবাইকে বলেন বাড়ি বদল করে আমরা অনেক জিতেছি। বাড়িটা ছাড়াও জমিদারদের একটা কমলার বাগান ছিলো। সেটাও আমরা পেয়েছি! তবু দাদুর আড়ালে বড় জেঠু প্রায়ই

বাবা, কাকাদের বলেন, আমরা নাকি ঠকেছি! দাদুর নাকি এতটুকু বৈষয়িক বুদ্ধি নেই। জেঠুরা যখন এসব কথা আলোচনা করেন তখন আমাদের সেখানে থাকতে দেন না। তবে ওঁরা যে সুযোগ পেলেই দাদুকে বোকা বলবেন এটা আমাদের অজানা নয়। কতদিন লুকিয়ে বড়দের সে-সব কথা শুনেছি।

বিকেলে আমরা তিন জন তিন গ্লাস দুধ খেয়ে উলের চাদর গায়ে জড়িয়ে কমলাবাগানে বসে গল্প করছিলাম। জয়ন্তিয়া পাহাড়ের ওপর দিয়ে হিমালয় থেকে হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। আগে নাকি একবার শীতের সময় ঘাসের শিশিরকণা জমে বরফ হয়ে গিয়েছিলো। পিয়াইন নদীতে বরফের টুকরো ভেসে এসেছিলো। এসব কথা বলেছেন সরকার দাদু। জাফলং-এর সবচেয়ে পুরোনো বাসিন্দা তাঁরা। আমাদের নয়নতারা কুটিরের জমিদারদের সঙ্গে ওঁর ভারি ভাব ছিলো। আমাদের দাদুর সঙ্গেও ভাব হয়ে গেছে। বিকেলে ওঁরা চৌধুরীদের পুকুরঘাটে বসে গল্প করেন। জাফলং-এর মতো তাজা বাতাস নাকি আর কোথাও নেই। এখানকার ঝর্নার পানিতে রোজ গা ডুবিয়ে বসে থাকলে অনেকদিনের পুরোনো বাতের অসুখ ভালো হয়ে যায়। খাসিয়ারা পাহাড়ে বাসমতি ধানের চাষ করে। যুঁইফুলের মতো সাদা ধবধবে সেই ভাত খেলে বহুক্ষণ হাতে মিষ্টি গন্ধ লেগে থাকে। এখানকার কমলা আর নাশপাতি যে একবার খেয়েছে, সারাজীবনও ভুলতে পারবে না। আমি দেখেছি বুড়োরা অসুখ আর খাবার ছাড়া অন্য কোনো বিষয় নিয়ে গল্প করতে পারেন না। মা-কাকিমার সবসময় শিলং-এর গল্প করেন। ওঁদের জন্যে বাড়িতে 'বেগম পত্রিকা' আসে। আমাদের জন্য আসে 'শুকতারা'। আজকাল শুকতারা আমার ভালো লাগে না। বিজু দেখি গোগ্রাসে গেলে। রামু পড়ার বই ছাড়া গল্পের বইপত্র খুব কমই পড়ে।

পাহাড়ের নিচে ঝর্নার পানিতে ছোট ছোট নুড়ি ছুড়ে মারছিলো রামু। পানিতে নুড়ি পড়ার টুংটাং শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। এদিকের পাহাড়াগুলো সব ছোটবড় নুড়িপাথরে বোঝাই হয়ে আছে। বর্ষার সময় পাহাড়ি ঝর্নায় অনেক সময় বড় পাথর গড়িয়ে আসে। এখন ঝর্নার পানি শান্ত সবুজ কাচের মতো। রোদেলা দুপুরে ঝর্নার গভীরে শুয়ে থাকা বড় পাথর আর রঙিন নুড়িগুলো ঝলমলে আলো ছড়ায়। আগে আমার রঙিন পাথর জমানোর সখ ছিলো। প্যাট্রিকের রঙিন পাথরের ওপর লোভ দেখে আমার সবগুলো পাথর ওকে দিয়ে ওর সঙ্গে ভাব জমিয়েছি। আমার লোভ ছিল ওদের চার আলমারি বইয়ের ওপর। এখনো আমি প্যাট্রিকদের সব বই পড়ে শেষ করতে পারি নি।

বিজু বললো, 'এবারের শুকতারায় তুষার-মানবের গল্পটা পড়েছিস আবু? আমাদের জাফলং-এ যদি হিমালয় থেকে ও রকম একটা ইয়েতি নেমে আসতো!'

আমি বললাম, 'ওটা একটা যাচ্ছেতাই গল্প। তার চেয়ে হিমালয়ের ভয়ংকর অনেক ভালো।'

বিজু বললো, 'তুই হিমালয়ের ভয়ংকর কোথায় পেলি?'

আমি জবাব দিলাম, 'প্যাট্রিকের কাছ থেকে। সে তো অনেক আগের কথা।'

বিজু মুখ কালো করে বললো, 'বারে, বইটা কবে থেকে আমি খুঁজছি আর তুই লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে ফেলেছিস?'

বিজু এত সাধারণ ব্যাপার নিয়ে অভিমান করে যে মাঝেমাঝে আমার ভারি রাগ হয়। রামু ঝর্নায় নুড়ি ছুড়তে ছুড়তে হেসে বললো, 'তুই কবে শুকতারায় বিজ্ঞাপন দেখেছিস সেটা আবু কী করে জানবে! বই পড়তে চাইলে আবুর মতো লুকিয়ে প্যাট্রিকের সঙ্গে ভাব জমাগে, ওদের অনেক বই আছে।'

রামুর এ ধরনের বাঁকা কথা আমার ভালো লাগে না। আমি বললাম, 'কারো সঙ্গে ভাব জমাতে তো আমি কাউকে বারণ করি নি রামু। মেজ কাকিমা বললো, তুই নাকি সোনিয়ার সঙ্গে কথা বলতে চাস। তোকেও বলি রামু, ওভাবে কারো সঙ্গে ভাব জমানো যায় না।'

আমার কথা শুনে রামুর মুখটা বোকা-বোকা হয়ে গেলো। ও একটু হাসার চেষ্টা করে বললো, 'মেজ কাকিমা বুঝি তোকে বলেছে ওইসব! তুই যখন ভাব জমানোর ওস্তাদ, তখন সোনিয়ার সঙ্গে চেষ্টা করে দেখ না পারিস কিনা। ও তোকে পাত্তাই দেব না।'

আমি মুখ টিপে হেসে বললাম, 'দেয় কি না দেয় তুই জানিস কী করে? যখন দরকার হবে তখন ঠিকই ভাব জমাবো। তবে তোর মতো নিশ্চয়ই আমলকির আচার ঘুষ দিতে যাবো না'

'সোনিয়া প্যাট্রিকের মতো নয় যে রঙিন পাথর দিয়ে পটাবি।'

'আমার জানা আছে কার সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়।'

আমাদের এরকম খোঁচা দেয়া শুরু হলে, বাধা না-পড়া পর্যন্ত চলতেই থাকে। একবার ছোড়দি বলেছিলো, 'মনে হচ্ছে তোরা অনন্তকাল ধরে এভাবে কথা বলে যেতে পারবি।' আমারও মাঝে মাঝে তাই মনে হয়।

হঠাৎ বিজু আমাদের কথার মাঝখানে বাধা দিলো। আঙুল তুলে বললো, 'দেখ দেখ, একটা লোক এদিকে আসছে।' আমি আর রামু একসঙ্গে সেদিকে তাকালাম।

তখনও বেশ দূরে ছিলেন তিনি। এই এলাকায় যে নতুন এসেছেন সেটা ওঁর হাঁটা দেখলেই বোঝা যায়। পাহাড়ের চড়াই দিয়ে ওঠার সময় বারবার নুড়িতে ওঁর পা পিছলে যাচ্ছিলো। আমাদের কখনো অমন হয় না। জাফলং-এর সবাই জানে কীভাবে নুড়ি-ছড়ানো পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই দিয়ে হাঁটতে হয়। তিনি আসছিলেন জয়ন্তিয়া পাহাড় থেকে। জয়ন্তিয়া পাহাড়ে শুধু টং বেঁধে পাহাড়ি খাসিয়ারা থাকে। ওদের ওখানে এরকম একজন প্যান্টশার্টপরা, পিঠে ব্যাগ ঝোলানো ভদ্রলোক কোত্থেকে আসবেন আমরা ভেবে পেলাম না। আজকাল

অবশ্য কিছুকিছু খাসিয়া ছেলে খ্রিস্টান হয়ে প্যান্টশার্ট পরা শুরু করেছে।

আরো কাছে আসার পর দেখলাম রীতিমতো ভদ্রলোক। ছোড়দাদের বয়সী হবেন। বেশ লম্বা দেখতে, গায়ের রঙটা তামাটে, পরনে জিনস-এর প্যান্ট আর জ্যাকেট; অনেকটা সিনেমার হিচ হাইকারদের মতো।

বিজু ফিসফিস করে বললো, 'নিশ্চয়ই সোনিয়াদের বাড়িতে এসেছেন।'

রামু বললো, 'সোনিয়াদের বাড়িতে যাবার রাস্তা এটা নয়। ইনি যেদিক থেকে আসছেন তার আশেপাশে কোনো রাস্তাঘাট নেই।'

আমি বললাম, 'মনে হচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে আসছেন।'

রামু তার সঙ্গে যোগ করলো, 'বিনা পাসপোর্টে।'

বিজু বললো, 'ঠিক বলেছিস। পাসপোর্ট থাকলে নিশ্চয়ই চেকপোস্ট দিয়ে আসতেন।'

রামু বললো, 'তখন আর তিনি আমাদের নজরে পড়তেন না।'

ভদ্রলোক আমাদের একেবারে কাছে এসে গেলেন। আমরা তিনজন হা করে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। ভদ্রলোক আমাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। কাছে এসে ধুপ করে মাটিতে বসে পড়লেন। বললেন, 'তোমরা বুঝি এখানে থাকো?'

আমি মাথা নাড়লাম। রামু বলল, 'আপনি কোত্থেকে এসেছেন?'

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, 'অনেক দূর থেকে। আপাতত আসছি চেরাপুঞ্জি থেকে।'

রামু আমার দিকে আড়চোখে তাকালো। বিজু বললো, 'আমরাও তাই ভেবেছিলাম। আপনি নিশ্চয়ই পাসপোর্ট করে আসেন নি।'

ভদ্রলোক এবারও হেসে শুধু মাথা নাড়লেন। রামু আবার আমার দিকে তাকালো। ভদ্রলোক একটা লম্বা দম টেনে বললেন, 'আহ কী তাজা বাতাস! সূর্য ওঠার আগে হাঁটা শুরু করেছি। পথে একবার মাত্র থেমেছিলাম।'

আমি বললাম, 'চেরাপুঞ্জি থেকে এখানে আসার পথ কি খুব খারাপ?'

ভদ্রলোক আগের মতো হেসে বললেন, 'পথ কোথায়? আমি তো আগাগোড়া পাহাড় ডিঙিয়ে এসেছি। কী বিচ্ছিরি পাহাড়, সব আলগা পাথর ছড়িয়ে আছে। আমি রামুর দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসলাম। রামু বলল, 'আপনি এই এলাকায় নতুন এসেছেন। এসব পাহাড়ে চলাফেরা করতে হলে অভ্যেস থাকা দরকার। খাসিয়ারা যখন ভারি বোঝা নিয়ে হাঁটে তখন ওদের পা একটুও পিছলে যায় না।'

ভদ্রলোক কোনো কথা না বলে লম্বা লম্বা দম টেনে বুকটা তাজা বাতাসে ভরে ফেললেন। আমি আস্তে আস্তে জানতে চাইলাম, 'আপনি কি জাফলং-এ এসেছেন?

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন। লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'কোথায় যাব আমি নিজেই জানি না।' একটু থেমে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে কী জানি

ভাবলেন। তারপর বললেন, 'আমাকে পুলিস তাড়া করছে। আমি একজন পলাতক রাজনৈতিক কর্মী। আজকের রাতটা আমাকে জাফলং-এ কাটাতে হবে।'

পশ্চিমের ঝাউবনের আড়ালে শেষবিকেলের সূর্যটা কিছুক্ষণ আগে ডুবে গেছে। একটু পরে সন্ধ্যা নামবে। হিমালয় থেকে হু হু করে একঝলক উত্তুরে বাতাস আমাদের গা কাঁপিয়ে বয়ে গেলো। আমাদের সামনে বসে একুশ-বাইশ বছর বয়সের যে যুবকটি বসে সিগারেট খাচ্ছেন, যাঁকে দেখে বিদেশী ছবির নায়কের কথা মনে হয়েছিলো, তিনি আসলে একজন বিপ্লবী—ধাক্কাটা সামলাতে আমাদের তিনজনের বেশকিছু সময় লাগলো।

একটি উত্তেজনাময় সন্ধ্যা

পশ্চিমের লাল আকাশের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক আপনমনে সিগারেট টানছিলেন। বিজু আর রামু দুজন একসঙ্গে আমার দিকে তাকালো। আমি বললাম, 'জাফলং-এ আপনার পরিচিত কেউ আছেন?'

ভদ্রলোক আকাশের ওপর চোখ রেখে শুধু মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালেন। রামু আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললো, 'ওঁকে আমাদের বাসায় থাকতে বলবি?'

আমি চাপা গলায় বললাম, 'লুকিয়ে রাখতে হবে যে। বড় জেঠু জানতে পারলে হুলস্থুল কাণ্ড বাঁধাবে।'

রামু তেমনি ফিসফিস করে বললো, 'এক রাত আমাদের সঙ্গে চিলেকোঠার ঘরেই থাকতে পারেন।'

আমি মাথা নেড়ে সায় জানলাম। ভদ্রলোককে বললাম, 'আপনি ইচ্ছে করলে আমাদের সঙ্গে থাকতে পারেন।'

এইবার তিনি আমাদের দিকে তাকালেন। মিষ্টি হেসে বললেন 'এক রাতের ব্যাপার তো। তোমারা যদি আমার কথা কাউকে না বলো তাহলে এই পাহাড়েই রাতটা কাটিয়ে দিতে পারবো। গাছতলায় ঘুমোনোর অভ্যেস আছে আমার।'

আমি বললাম, 'এখানকার শীত সম্পর্কে আপনার তাহলে কোনো ধারণাই নেই। বাতির আগুন না জ্বেলে আপনি থাকতেই পারবেন না। আর বাগানে আগুন দেখলেই পাহারাদার এসে ধরবে।'

'আমাকে বাসায় নিয়ে কী বলবে?' ভদ্রলোক একটু গম্ভীর হয়ে জানতে চাইলেন।

'কাউকে কিছু বলতে হবে না। আপনাকে চিলেকোঠার ঘরে লুকিয়ে রাখবো।'

'তোমরা আমার জন্যে কেন এতটা করবে? পুলিসেরা টের পেলে তোমাদের সবারই বিপদ হবে!'

তাঁর কথার কী জবাব দেবো কিছুক্ষণ ভেবে পেলাম না। তারপর তাঁকে যে কথাটা বললাম সে কথা আমরা অচেনা কাউকে বলি না। আমি রীতিমতো গম্ভীর হয়ে বললাম, 'আমাদের বড়দাও একজন বিপ্লবী। তিনবছর ধরে তিনি জেলে আছেন। আপনাকে দেখে বড়দার কথা পড়লো বলেই আপনার জন্যে আমাদের ভাবতে হচ্ছে।'

বড়দা বড় জেঠুর ছেলে, আমাদের বংশের সবার বড়। বড়দা বহুদিন গোপন ছিলেন। সেবার জেঠিমা মারা যাবার খবর শুনে যখন দেখতে এলেন, তখনই পুলিস এসে তাঁকে ধরে নিয়ে গেলো। আমরা তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। বড়দাকে আমরা কখনো কাছে না পেলেও তাঁর জন্য আমাদের তিনজনের মনের ভেতর নরম একটা জায়গা ছিলো। বাড়িতে কেউ কখনো বড়দার কথা বলে না। বড়দার কথা শুনলেই বড় জেঠু বলেন, 'এ বাড়িতে ওর নাম কেউ উচ্চারণ করবে না। ও আমার ছেলে নয়।' জেল থেকে মাঝে মাঝে দিদা আর জেঠুর কাছে বড়দার চিঠি আসে। জেঠু কখনো বড়দার চিঠির জবাব দেন না। তবে মা জেঠুকে একদিন সেই চিঠি পড়ে কাঁদতে দেখেছেন।

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে আপনমনে বললেন, 'আমি জানি বাংলাদেশের ঘরে ঘরে বিপ্লবীরা আছে। তাদের ভাইবোনেরা আছে। একজন বিপ্লবীর এর চেয়ে নিরাপদ আশ্রয় আর কী হতে পারে!'

রামু খুশিতে চেঁচিয়ে উঠলো, 'আপনি তাহলে সত্যি আমাদের সঙ্গে থাকছেন?'

ভদ্রলোক হেসে রামুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই। আমিও তোমাদের ভাই।'

আমি হেসে বললাম, 'তাহলে আপনাকে আমরা কী ডাকবো বলে দিন।'

তিনি একটু ভেবে মৃদু হেসে বললেন, 'ছোটবেলায় আমাকে বাড়িতে দুলাল ডাকতো। এ-নামে এখন আমাকে কেউ চেনে না! ডাকার মতো কেউ আর বেঁচেও নেই। তোমরা আমাকে দুলালদা ডাকতে পারো।'

রামু আর বিজু প্রায় একসঙ্গে বললো, 'কী সুন্দর নাম দুলালদা। কেউ না

ডাকুক আমরা ডাকবো।'

দুলালদাকে আমাদের প্রথম থেকেই ভালো লেগে গিয়েছিলো। সেজদা, ঝন্টুদা, ছোটদারা সবাই দল বেঁধে নাটক করেন, আমাদের কাছেও ঘেঁষতে দেন না। বলেন, বড়দের এখানে ঘুরঘুর করিস কেন? দুলালদা কী চমৎকার বন্ধুর মতো কথা বলেন। মনেই হয় না যে তিনি আমাদের চেয়ে ছ'সাত বছরের বড়।

রামু বললো, 'অন্ধকার হয়ে এলো। চল্ বাড়ি যাই।'

কখন যে আমাদের চারপাশে অন্ধকার জমতে শুরু করেছে টেরও পাই নি। জেঠিমা নির্ঘাত একচোট বকবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিজু বললো, 'দুলালদাকে নিয়ে বাসায় ঢুকবি কীভাবে?'

আমি বললাম, 'তোরা আগে চলে যা। পেছনের খিড়কি দরজাটা খুলে রাখিস। আমি দুলালদাকে নিয়ে একটু পরে আসছি। জেঠিমা জিজ্ঞেস করলে বলিস আমি প্যাট্রিকদের বাসায় গেছি।'

রামু আর বিজু উঠে চলে গেলো। দুলালদা আমাদের বাড়ির সব কথা শুনলেন। রামুর বাবা নেই শুনে দুঃখ পেলেন। মেজ জেঠু রোড এ্যাকসিডেন্টে কীভাবে মারা গেলেন, জেঠিমা আর রামু কীরকম আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে গিয়েছিল, সবই দুলালদাকে বললাম। এমনকি সোনিয়ার কথাও বাদ গেলো না। তবে একটু বাড়িয়ে বললাম, সোনিয়া আমার বন্ধু। দুলালদা বললেন, 'আমার কথা তোমাদেরকে রাতে বলবো। অবশ্য তোমরা যদি শুনতে চাও।'

আমি বললাম, 'আপনার সব কথা না শুনলে রাতে আমাদের ঘুম হবে না দুলাল দা।'

দুলালদাকে নিয়ে যখন বাড়িতে এলাম তখন রীতিমতো রাত হয়ে গেছে। উঠোনে ছোড়দারা হাত-পা ছুঁড়ে গলা ফাটিয়ে সিরাজউদ্দৌলা নাটকের মহড়া দিচ্ছেন। আমরা সদর দরজা দিয়ে না ঢুকে পাচিলের গা ঘেঁষে খিড়কি দরজার দিকে গেলাম। নানারকম ময়লা আবর্জনা মাড়িয়ে যখন লোহার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে যাবো তখন অন্ধকার ফুঁড়ে রামু বেরিয়ে এলো। ফিসফিস করে বললো, 'এত দেরি করলি কেন? কখন থেকে দাঁড়িয়ে মশার কামড় খাচ্ছি! সোজা উঠে যা। আমি ছাদে যাবার বড় দরজা বন্ধ করে দিয়েছি।'

অন্ধকারে ভূতের মতো রামুকে দেখে আমি দারুণ চমকে উঠেছিলাম। রীতিমতো ভয়ই পেয়েছিলাম। কাঁধের ওপর দুলালদা হাত রাখতেই সব ভয় কর্পূরের মতো উবে গেলো। আমরা দুজন পা টিপে টিপে ছাদে উঠে এলাম। পুরোনো লোহার সিঁড়ি বেয়ে জোরে উঠতে গেলেই বিচিত্র সব শব্দ হয়।

ছাদের ওপর চন্দনের গুঁড়োর মতো মোলায়েম জ্যোৎস্না এখানে-সেখানে ছড়িয়ে ছিলো। চারপাশে কালো কালো পাহাড়ের সারি। মনে হয় সাদা কুয়াশার আকাশের নিচে জমাট বাঁধা উত্তাল কালো সমুদ্র। দূরের পাহাড়গুলো ঘন সাদা

কুয়াশার চাদরের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। দুলালরা বললেন, 'কী চমৎকার রাত।'

এরকম চমৎকার রাত আমরা রোজই দেখি। তবে এমন উত্তেজনা আগে কখনো বোধ করি নি। পুলিস হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে এমন একজন বিপ্লবীকে আমরা আশ্রয় দিয়েছি, তাঁর ভালো-মন্দের ভার সবটুকু আমাদের ওপর—এর চেয়ে রোমাঞ্চকর আর কী হতে পারে। অথচ সাত ঘন্টা আগেও আমরা তিনজন ভাবছিলাম, উত্তেজনার অভাবে আমাদের জীবনটা কীরকম ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে।

দুলালদা চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। রামু এসে বললো, 'কার্নিশের ধারে যাবেন না দুলালদা।'

দুলালদা একটু অবাক হয়ে বললেন, 'কেন রামু, পড়ে যাব নাকি!'

রামু হেসে বলল, 'তা কেন! কার্নিশের ধারে আপনার মতো লম্বা কেউ হাঁটলে, দোতালার বারান্দা থেকে দেখা যাবে যে।'

রামুর কথা শুনে দুলালদা হেসে ফেললেন— 'তাই বলো। ঠিক আছে রামু, আমি ছাদের মাঝখানেই থাকবো।' এই বলে দুলালদা কী যেন ভাবলেন, আপনমনে মৃদু হাসলেন—যেন একটা মজার কথা মনে পড়েছে। তারপর বললেন, 'আমাদের বাড়িতে এরকম বিশাল এক ছাদ ছিলো। এরকম বিশাল এক ছাদ ছিলো। ছোটবেলায় ছাদে উঠে ঘুড়ি ওড়াতাম, আর মা সবসময় বলতেন, কার্নিশের ধারে যাসনে দুলাল! তোমার কথা শুনে সেই ঘুড়ি ওড়ানোর দিনগুলোর কাছে ফিরে গিয়েছিলাম।'

কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে আমি বললাম, 'ঘরে চলুন দুলালদা, কুয়াশা পড়ছে।'

দুলালদা চিলেকোঠার ঘরে ঢুকে বললেন, 'সত্যিই তোমাদের এখানে শীতটা বেশি।'

আমাদের চিলেকোঠার ঘরটা খুব ছোট না হলেও নানারকম অকেজো জিনিসপত্রে সবসময় বোঝাই থাকে। এইসব অকেজো জিনিসের কিছু বাড়ির আর বেশিরভাগই আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি। ঘরের চারভাগের একভাগ জায়গা দখল করে রেখেছে, দাদু আর দিদার বিয়ের সময়কার প্রকাণ্ড মেহগিনি কাঠের পালঙ্কটা। আমাদের মতো পাঁচজন শুতে পারে সেখানে। বাকি জায়গাটুকুর পাঁচভাগের একভাগ জায়গা দখল করেছে দিদার মায়ের দেয়া বর্মীসেগুন কাঠের একটা সিন্দুক। সিন্দুকের পায়ে আঙুরলতার নকশা-কাটা রয়েছে। সিন্দুকের ভেতরের জিনিসপত্র অবশ্য সবই আমাদের তিনজনের। এ ছাড়া দুটো ছোট্ট টেবিল আর একটা রঙচটা ডিভানে ঘরের প্রায় পুরোটাই ভরে আছে।

দেয়ালে ক্যালেন্ডার-কাটা ছবি, ময়ূরের পালক, হরিণের শিং, রঙচঙে ঢাউস ঘুড়ি, রঙিন পেন্সিল দিয়ে বিজুর আঁকা অভিনব প্রাকৃতিক দৃশ্য—সবকিছু দেখে

দুলালদা বললেন, 'বাহ্ চমৎকার ঘর তো তোমাদের! ছোটবেলায় দেয়ালে ছবি সাঁটার জন্যে কতদিন যে বাবার বকুনি খেয়েছি আমি। তোমরা বারবার আমাকে ছোটবেলার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছো।'

আমাদের ঘরটা সবসময় ভীষণ নোংরা থাকে। ভাগ্যিস রামু আর বিজু আগে এসে বুদ্ধি করে ঘরটা পরিষ্কার করে রেখেছিলো। নইলে ভারি লজ্জা পেতাম। বিজু এসে বললো, 'তোরা খেতে যাবি না? মা বলছে কতক্ষণ তোদের জন্য বসে থাকবে?'

রামু বললো, 'তুই খেয়ে নিয়েছিস তো?'

বিজু জামার হাতায় মুখ মুছে ঘাড় কাত করে সায় জানালো। আমি বললাম, 'তুই তাহলে দুলালদার কাছে থাক। আমি আর রামু এক্ষুনি আসছি।'

আমরা সবসময় রান্নাঘরে বসে খাই। খাবারঘর বড়দের জন্যে। দু'বছর ধরে ছোড়দা খাবারঘরে যাচ্ছে। নইলে আগে পাটি পেতে বসে আমাদের সঙ্গেই খেত। রান্নাঘরে খেতে অবশ্য কোনো অসুবিধে হয় না। পচার মা দুবেলা ঘষেমেজে সবকিছু তকতকে করে রাখে। ও নাকি নোংরা একটুও সহ্য করতে পারে না। পচা যখন ছোট ছিল তখন ওকে কোলে নিতো না, পাছে ও কাপড় নোংরা করে দেয় সেই ভয়ে। মা বলেন, 'এটা এক ধরনের বাতিক।'

আমরা রান্নাঘরে ঢুকতেই সেজ কাকিমা বললেন, 'তোদের হল কী বল্ তো, কখন থেকে তোদের ডাকছি, এদিকে জ্বরে আমার গা পুড়ে যাচ্ছে। তা কতক্ষণ বসে থাকি বল।!'

রামু বললো, 'সেকি কাকিমা, ছোড়দা তোমাকে ওষুধ এনে দেয় নি?'

'আর দিয়েছে!' সেজ কাকিমা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমার ওষুধ আনতে গেলে ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে পাড়া মাত করে নাটকের মহড়া দেবে কে! ওদের চ্যাঁচানিতে আমার মাথা ধরা আরো বেড়ে গেছে।'

ছোড়দা আর ঝন্টুদার গলার প্রশংসা না করে পারা যায় না। রান্নাঘরর থেকেও ওদের—'বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার মহান অধিপতি, আমি তোমায় ভুলি নি জনাব' ইত্যাদি শোনা যাচ্ছিল। ছোড়দারা সামাজিক নাটক করেন না। বলেন, ওসব নাটকে নাকি গলা খুলে সংলাপ বলা যায় না। তাই তাঁরা সবসময় সিরাজউদ্দৌলা, টিপু সুলতান, শাহজাহান্, মেবার পতন-এসব নাটক করবেন।

রামু সমবেদনার সুরে সেজ কাকিমাকে বললো 'তুমি গিয়ে শুয়ে থাকো গে কাকিমা। খাবার আমরা আমাদের ঘরে নিয়ে যাচ্ছি। খেয়ে উঠেই তোমার ওষুধ এনে দেবো।'

সেজ কাকিমা রেহাই পেয়ে খুশি হয়ে বললেন, 'তোদের সব বেড়ে রেখেছি। দরকার হলে জালের আলমারি থেকে নিস। মা পায়েস না খেয়ে তোদের জন্যে রেখে দিয়েছেন।'

আমরা মাঝে মাঝে আমাদের খাবার ঘরে নিয়ে গিয়ে খাই। সেজ কাকিমা চলে যাওয়ার পর আমরা এলমুনিয়ামের গামলায় আরো কিছু ভাত বেড়ে নিলাম। বাটিতে যতটুকু তরকারি ছিলো তাতে তিনজন অনায়াসে খেতে পারবো। তরকারি বাড়ার সময় দিদা নির্ঘাত সামনে ছিলেন না।

রামু প্লেট আর তরকারির বাটি দুটো নিলো। আমি ভাতের গামলা, পানির জগ আর দুটো গ্লাস নিয়ে বেশ কসরত করেই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিলাম। দোতালায় উঠতেই বড় জেঠুর সামনে পড়ে গেলাম। বড় জেঠু আমাদের দেখে চোখ পিটপিট করে বললেন, 'বাড়িতে কেউ এসেছে নাকি। খাবার নিচ্ছিস কার জন্যে?'

আমার বুকের ভেতর ধুপধাপ শব্দ আরম্ভ হলো। তাকিয়ে দেখি রামুর মুখটা কাগজের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আমি ঢোক গিলে বললাম, 'সেজ কাকিমার ভীষণ জ্বর এসেছে। আমাদের দেরি হবে শুনে কাকিমা বললেন খাবার ওপরে নিয়ে যেতে।'

বড় জেঠু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'খেতে দেরি হবে কেন, বিকেলে বুঝি বাজারে গিয়ে তেলেভাজা খেয়েছিস?'

রামু বলল, 'কে বলেছে আমরা তেরেভাজা খেয়েছি! আবুর খিদে পায় নি বলেই তো কাকিমা বললেন। আমার সেই কখন ক্ষিদে পেয়েছে।'

বড় জেঠুকে দেখে কেউ ভয় পাচ্ছে এটা বুঝতে পারলে তিনি খুব খুশি হন। আমাদের ভাবখানা ছিল ভয়ে যেন আত্মাপাখি খাঁচা-ছাড়া হয়ে গেছে। হঠাৎ জেঠুর খেয়াল হলো সেজ কাকিমার অসুখ। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'সেজ বৌয়ের অসুখ, হাঁদা ওষুধ এনে দেয় নি।?'

আমি বললাম, ' খেয়ে উঠে রামু আর আমি যাবো।'

বড় জেঠুর মেজাজ তক্ষুনি সপ্তমে চড়ে গেল। 'তোরা কী ওষুধ আনবি? হাঁদা বুঝি এখনো উঠোনে বসে চ্যাঁচাচ্ছে? দাঁড়া, ওর পিঠে আমি আস্ত খড়ম ভাঙবো। পরীক্ষায় ফেল করে ওর চর্বি বেড়েছে।' এই বলে বড় জেটু খড়ম পায়ে খটাশ খটাশ শব্দ তুলে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলেন। আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

দুলালদাকে খাওয়াতে গিয়ে বড়দার কথা মনে পড়ে গেলো। দিদা মাঝে মাঝে আপনমনে বলেন, ছোঁড়াটা না-খেয়ে না-দেয়ে বনে-বাদাড়ে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে। বড়দার কথা ভাবলে দিদার মন খারাপ হয়ে যায়। বড়দার সঙ্গে কখনো যদি দেখা হয় তখন দুলালদার কথা তাঁকে বলবো! বড়দা যে তখন আমাদের আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরবেন এ কথা হলপ করে বলতে পারি। আবার ভাবলাম, আহা বড়দা যদি এসময়ে বাড়িতে থাকতেন! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো বড়দা এখন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের ছোট্ট একটা সেলে বন্দি হয়ে আছেন। কথাটা ভাবতেই বুকের ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা মনে হলো।

খাবার দেখে দুলালদার মুখটা খুশিতে চকচক করে উঠলো। বুঝলাম সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি। ছাদে গিয়ে দুলালদা জগের পানিতে মুখহাত ধুয়ে নিলেন। তারপর আমাদের ময়লা তোয়ালেতে মুখ মুছে খেতে বসলেন। বলেন, 'কতদিন পর যে ভাত খাচ্ছি মনে নেই।'

রামু দুলালদাকে খাবার বেড়ে দিচ্ছিলো। আর দুলালদা—' এত সুন্দর ভাত আমি জীবনেও খাই নি; কী চমৎকার রান্না।' এসব কথা বলছিলেন ।

আমি খেতে খেতে দুলালদাকে বললাম, 'আজ রাতে ঘুমোনো চলবে না। আমরা আপনার গল্প শুনবো।'

উত্তেজনা, উদ্বেগ আর আনন্দে আমার খিদে বহু আগেই উবে গিয়েছিলো। শুধু ভদ্রতা করার জন্যেই বসা। দুলালদা অবশ্য খেতে বসে মেয়েদের মতো লজ্জা করেন নি।

বিজুর মতো সারাক্ষণ খাইখাই স্বভাব অবশ্য আমার নয়। তবে খেতে বসে কেন লজ্জা করবো এটা আমি কখনো বুঝে উঠতে পারি নি। বড়দা আর দুলালদাদের কথা অবশ্য আলাদা। ওঁদের না-খেয়ে থাকার অভ্যেস করতে হয়।

একজন বিপ্লবীর গল্প

খেয়ে উঠে হাত ধুয়ে আবার নোংরা তোয়ালেতে মুখ মুছে দুলালদা একটা চার্মিনার সিগারেট ধরালেন। বাইরে তখন হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। মনে হচ্ছে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেই বুঝি বরফ-ঢাকা হিমালয় দেখা যাবে। একটু জোরে বাতাস বইলে ঝাউবনে শনশন শব্দ হয়। কত রাতে লেপের তলায় শুয়ে সেই শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে গেছি। কদিন পরে হাড় কাঁপিয়ে যে শীত নামবে, শুধু লেপ গায়ে দিয়ে সেই শীত তাড়ানো যাবে না। তখন পচার মা মাটির আঙটায় করে ঘরে আগুন রেখে যায়। শীতের সময় ভোর রাতের দিকে মনে হয়, আমাদের লেপের ওপর বুঝি কেউ ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিয়েছে। গরম মুজোর ভেতর হাত-পা সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কোনো রাতে যদি মুখে গ্লিসারিন মাখতে ভুলে যাই, পরদিন মুখ ধোবার সময় ঠোঁট দুটো ভীষণ জ্বলতে থাকে।

ঠাণ্ডা শুকনো বাতাসে ঠোঁট-মুখ ফেটে গিয়ে চড়চড় করে।

জানালা দিয়ে একঝলক ঠাণ্ডা ভেজা-বাতাস হুড়মুড় করে ঘরের ভেতর ঢুকে গেলো। রামু উঠে বন্ধ করে দিলো জানালাটা। আমরা তিনজন লেপ মুড়ি দিয়ে খাটের ওপর বসেছিলাম। দুলালদা কিছুতেই খাটে শুতে চাইলেন না। বললেন, 'ডিভানের ওপর চমৎকার রাত কাটিয়ে দেয়া যাবে। কতক্ষণই বা ঘুমোব!'

বিজু ওর লেপটা দুলালকে দিয়ে নিজে এসে রামুর লেপের তলায় ঢুকেছে। দুলালদার সিগারেটটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বার কয়েক জোরে টেনে এক বুক ধোঁয়া ছেড়ে ডিভানের ওপর লেপ মুড়ি দিয়ে বসে বললেন, 'বলো কী শুনতে চাও। আমার ছোটবেলার গল্প, না এখন কী করি সে-সব গল্প।'

বিজু বললো, 'ছোটবেলার গল্প।'

আমি বললাম, 'এখনকার গল্প।'

দুলালদা মৃদু হেসে বললেন, 'একসঙ্গে দুটো কী করে বলি!'

রামু বললো, 'আগে ছোটবেলার গল্প বলুন। তারপর এখনকার গল্প।'

দুলালদা হেসে ফেললেন, 'তুমি খুব হিসেবি ছেলে রামু। অঙ্কে কত পেয়েছো?'

রামু নির্লিপ্ত গলায় বললো, 'একশো। বিজু সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিস তো?'

বিজু ঘাড় নেড়ে সায় জানালো, আমরা তিনজন গভীর আগ্রহ নিয়ে দুলালদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি মনে মনে ভাবছিলাম, দুলালদার মতো আমার যদি একটা বন্ধু থাকতো, যার কাছ থেকে দারুণ রোমাঞ্চকর সব গল্প শোনা যেত আর তার উত্তেজনাময় অভিযানের সঙ্গী হওয়া যেতো, তাহলে বেশ হতো।

আমাদের আগ্রহভরা তিনটি মুখের দিকে তাকিয়ে দুলালদা মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, 'আমি কিন্তু ভালো বলতে পারি না। আর বলার মতো সে-রকম সাংঘাতিক কিছু নেইও। ছোটবেলাটা তোমাদের মতোই ক্লাস করে, ঘুড়ি উড়িয়ে, দল বেঁধে আড্ডা দিয়ে কাটিয়েছি। বাবা-মার একমাত্র ছেলে ছিলাম আমি। আমার বাবা এককালে কমিউনিষ্ট পার্টি করতেন। পরে পার্টি ছেড়ে বিরাট ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন। কোলকাতার আলীপুরে আমাদের নিজেদের বাড়ি ছিলো।'

বিজু বললো, 'ছিলো বলছেন কেন, এখন নেই?'

দুলালদা বললেন, 'হয়তো এখনো আছে। আমি জানি না। ছ'বছর ধরে বাড়ির সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই।'

বিজু আবার বললো, 'আপনার বাবা-মা নিশ্চয়ই এখনো সেই বাড়িতে থাকেন?'

দুলালদা ম্লান হেসে বললেন, 'আমি যখন তোমার মতো ছোট ছিলাম তখন

আমার মা মারা যান। বাবাকে ছ'বছর আগে বাড়িতে দেখে এসেছি। হয়তো তিনি এখনো বেঁচে আছেন। হয়তো-বা নেই। ছ'বছর আগে, বাড়ি-ঘর বাবা-মা সব কিছু ছেড়েই পার্টিতে যোগ দিয়েছিলাম।'

বিজু বললো, 'প্রথম থেকে বলুন দুলালদা। আপনার মায়ের কথা বলুন।'

দুলালদা কিছুক্ষণ চুপ থেকে কী যেন ভাবলেন। তারপর ম্লান হাসলেন— 'ছোটবেলার কথা আজকাল একেবারেই মনে করতে পারি না। আমার মাও রাজনীতি করতেন। বাবার চেয়ে মা অনেক বেশি সচেতন ছিলেন। খুব সাদামাটা থাকতেন। আলীপুরের বাড়িটা বাবা নিজের পছন্দমতো সাজিয়েছিলেন। মা বিলাসিতা ভালোবাসতেন না। আলীপুরের সেই ঝকঝকে বাড়িতে মাকে মনে হত অন্য বাড়ির কেউ। মা আমাকে বলতেন সৎপথে থেকে কেউ ধনী হতে পারে না। বড়লোক হতে গেলেই গরিব আর ভালো লোকদের ঠকাতে হয়। মা বাবাকে বলতেন, তুমি আমার বিশ্বাস, আমার আদর্শ সবকিছু ভেঙে দিয়েছো। তোমার সঙ্গে থাকাও অন্যায়। বাবা মার কথা শুনে শুধু হাসতেন। কখনো মাকে বলতেন, দুলালকে আমি আমার চেয়ে বড় ইঞ্জিনিয়ার বানাবো। মা বলতেন, তুমি না একসময় কমিউনিষ্ট পার্টি করতে! আমার ছেলেকে আমি নষ্ট হতে দেব না। কমিউনিষ্ট সম্পর্কে আমার একটা ধারণা ছোটবেলা থেকেই ছিলো। তখন আমি মাকে মনে করতাম কমিউনিস্ট। মা আমাকে বলতেন, তোর বাবা নিজেকে তো নষ্ট করেছে, আমার জীবনটাও নষ্ট করে দিয়েছে। দুলাল তুই বড় হয়ে গ্রামে চলে যাবি। গ্রামে গিয়ে মানুষের দুঃখ দূর করার জন্যে কাজ করবি। একদিন স্কুলে থেকে বাড়ি ফিরে শুনি মা নাকি হার্টফেল করে মারা গেছেন। বাড়িতে অনেক লোক। সবাই বাবাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। আমি মাকে একবার দেখেই ছুটে ছাদে চলে গিয়েছিলাম। বহুক্ষণ ছাদে বসে কেঁদেছিলাম। তারপর এক মহিলা এসে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, দুলাল তোর মা হার্টফেল করে মারা যান নি। তিনি আত্মহত্যা করেছেন।'

এইটুকু বলে দুলালদা থামলেন। তারপর যেন আপন মনে বললেন, 'আমার মার নাম ছিল রুনু।'

কিছুক্ষণের জন্যে দুলালদা অতীতের এক দুঃখময় সময়ের গভীরে হারিয়ে গেলেন। তাঁর হাতে-ধরা চারমিনার সিগারেটের মাথায় ছাই জমতে লাগলো। ঘরের ভেতরটা তের বছর বয়সের একটি মা-হারা ছেলের দুঃখে ভারী হয়ে গেলো। আমার বুকের ভেতর আমাদের বয়সী একজন দুলালের দুঃখ কান্নার ঢেউ তুললো। বিজু আস্তে আস্তে বললো, 'তারপর কী হল দুলালদা?'

দুলালদা হাতের শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে ম্লান হেসে বললেন, 'মা মারা যাবার পর থেকে বাবাকে আমি কখনো পছন্দ করতে পারি নি। অথচ আমার যাতে এতটুকু অযত্ন না হয় সেদিকে বাবা কড়া নজর

রাখতেন। একদিন বাবাকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, বাবা মা কেন মরে গেলেন? বাবা হেসে বললেন, তোর মা আসলে খুব বোকা ছিলো। জীবন সম্পর্কে আজকাল কেউ তোর মার মতো ওভাবে ভাবে না। বাবার কথাগুলো আমার একটুও ভালো লাগে নি। তখনই ঠিক করলাম, আর কেউ মার মতো না ভাবুক, আমি ভাববো। মার আলমারিতে অনেক বই ছিলো। বাবা ওসব বই দেখে হাসতেন। মা বলতেন, দুলাল বড় হয়ে পড়বে। আমি সেসব বই পড়া শুরু করলাম। লেখাপড়ায় আমি তোমাদের মতোই ছিলাম। ক্লাশে সবসময় ফার্স্ট-সেকেন্ড হতাম। ম্যাট্রিকে প্লেসও ছিল। কলেজে যাবার আগেই আমি মার আলমারির সব বই পড়ে ফেলেছিলাম। প্রায় সবই ছিল রাজনীতি, অর্থনীতি আর ইতিহাসের বই। গোর্কির মাদার, ফুরমানভের চাপায়েভ, অস্ত্রয়ভস্কির হাউ দা স্টিল ওয়াজ টেম্পার্ড-এর মতো বিপ্লবী সাহিত্যও মার আলমারিতে কম ছিলো না। তোমরা নিশ্চয়ই সেসব বই এখনো পড়ো নি?'

বিজু আর রামু একসঙ্গে আমার দিকে তাকালো। লজ্জায় আধখানা হয়ে বললাম, 'আমি শুধু গোর্কির মা পড়েছি। অন্যগুলোর নামও শুনি নি।'

দুলালদা বললেন, 'কলেজে আমার বন্ধু ছিল দীপা। আমরা পড়তাম প্রেসিডেন্সী কলেজে। দীপার সঙ্গে মাঝে মাঝে রাজনীতির বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম। কলেজে প্রথম দু'বছর কোনো পার্টিতে যোগ দিই নি। তখন আমাদের ওখানে সিপিএম-এর দোর্দণ্ড প্রতাপ। অথচ ওদের কাজ পুরোপুরি সমর্থন করতে পারতাম না। ওরা এম-এলদের বলত প্রতিক্রিয়াশীল। এটাও আমি বুঝতাম না— গ্রামে গিয়ে যারা বিপ্লবের জন্য কাজ করছে তাদের কেন প্রতিক্রিয়াশীল বলা হবে।'

বিজু বললো, 'প্রতিক্রিয়াশীল মানে কী দুলালদা?'

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'খুব বাজে লোককে বলে প্রতিক্রিয়াশীল।'

দুলালদা মৃদু হেসে বললেন, 'যারা প্রগতির শত্রু, যারা মানুষের ভালো চায় না তারাই প্রতিক্রিয়াশীল। আমি ভাবলাম ভুল করে কোথায় গিয়ে ঢুকবো, আর সবাই বলবে প্রতিক্রিয়াশীল এটা তো হতে পারে না। তবে ভোট দিয়ে আর পার্লামেন্টের কথা বলে যে আমাদের দেশে বিপ্লব হবে না এটা তখন আমি ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলাম। আমি তখন বিএসসিতে ভর্তি হয়েছি, একদিন দীপা এসে আমাকে কিছু লিফলেট আর পত্রিকা এনে দিলো। চারু মজুমদারের লেখা আমি তখনই প্রথম পড়লাম। পড়তে পড়তে দারুণ উত্তেজিত হয়ে গেলাম। পরদিন দীপাকে এসে বললাম, এটাই আমাদের পথ দীপা। আমি সব ঠিক করে ফেলেছি। দীপা শুধু বললো, আমি জানতাম তোমাকে আমরা পাবো।

'তারপর একদিন কলেজ ছাড়ার ডাক এল। সবকিছু ছেড়ে সেদিন ঠিকই বেরিয়ে এসেছিলাম। দীপা ছিলো আমার সঙ্গে। তখন আমার মনে হয়েছিলো

কিছুই আমার সাধ্যের বাইরে নয়। দু'বছরের মধ্যেই দেশকে মুক্ত করে ফেলবো। বিভিন্ন জায়গায় তখন আমাদের জোর লড়াই চলছে। আমি নিজেও বহু এ্যাকশনে গিয়েছি। কখনো পুলিসের সঙ্গে লড়াই করেছি। কখনো গ্রামের জোতদার মেরেছি। এরকম এক এ্যাকশানে গিয়ে একদিন দীপাকে হারালাম। চারু মজুমদার তখন আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। বলেছিলেন, এটা আত্মত্যাগের যুগ, আত্মরক্ষার নয়। জীবন দেয়ার অগ্রাধিকার পেয়েছি বলেই তো আমরা কমিউনিষ্ট।'

রামু বলল, 'চারু মজুমদারকে আপনি কখনো দেখেছেন দুলালদা?'

দুলালদা মাথা নাড়লেন, 'না দেখি নি। তবে তিনি আমাকে চিনতেন। আমরা সবসময় তাঁর সই করা সার্কুলার পেতাম। দীপা মারা যাবার পর তাঁর চিঠি পেয়ে আমি আরো বেশি সক্রিয় হয়ে উঠলাম। প্রত্যেকটা খতম-এ্যাকশনে আমি নিজে যেতাম। তখন আমাদের বলা হয়েছিলো, শ্রেণীশত্রুর রক্তে হাত না রাঙাতে পারলে কমিউনিস্ট হওয়া যায় না। নিজ হাতে কম করে হলেও তিরিশটা শ্রেণীশত্রু আমি খতম করেছি। পরে অবশ্য তদন্ত করে দেখা গেছে সবগুলো খতম সঠিক ছিলো না।

'এরপর শুরু হলো বিপর্যয়। প্রথমে কীভাবে বিপর্যয় শুরু হলো টেরও পাইনি। টের পেলাম তখন, যখন আমরা সিআরপি আর মিলিটারির তাড়া খেয়ে গ্রাম থেকে গ্রামে পালিয়ে বেড়াচ্ছি, কোথাও এতটুকু আশ্রয় পাচ্ছি না। এমনকি যে কৃষকদের মুক্তির জন্যে আমরা লড়াই করেছিলাম তারাও ভয়ে আমাদের আশ্রয় দিতে চাইলো না। আমাদের নিজেদের মুক্ত এলাকাগুলো একের পর এক হাতছাড়া হয়ে গেলো। খবর পেলাম কোলকাতায় আমাদের কমরেডদের পাড়া ঘেরাও করে ধরে এনে, মাথা কেটে নিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিচ্ছে। সনাক্ত করার জন্য শুধু মাথাটি রেখে দিতো। একাত্তর সালে কোলকাতায় একরাতে ওরা আমাদের সত্তুরজন কমরেডকে এভাবে হত্যা করেছিলো। আমরা একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লাম। নেতাদের কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে আমি আর দুজন কমরেড জব্বলপুরে পালিয়ে গেলাম। সেখানে পাহাড়ে লুকিয়েছিলাম কিছুদিন। আমাদের দেশটা খুবই বড়। অনেক মানুষও সেখানে। তবু লুকিয়ে থাকার মতো যথেষ্ট জায়গা কিন্তু সেখানে নেই। আমি বাঙালি; উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম যেদিকেই যাই মানুষের চোখে ধুলো দিতে পারি না। আমাদের উদ্দেশ্যহীন পথ চলাটাকে অনেকে সন্দেহের চোখে দেখতো, কাজ করতে চাইতাম, কাজ পেতাম না। জব্বলপুরে কতদিন শুধু ঝর্নার পানি খেয়ে কাটিয়েছি। এ-সময়ে শুধু একটা কাজই ঠিকমতো করেছি, সেটা হচ্ছে পড়াশোনা। পার্টিতে ঢোকার পর যে-কাজটি একেবারেই হতো না। তবে নিজেদের কাজের সঙ্গে তত্ত্বকে মেলাতে না পেরে তখন আরো হতাশ হচ্ছিলাম।

নিজেদের পুরো কাজের তদন্ত করে দেখলাম এতদিন আমরা শুধু একটার পর একটা ভুলই করে এসেছি। ভুল যখন করেছি তার মাশুল তো দিতেই হবে। যখন খবর পেতাম আমার দীর্ঘদিনের সহকর্মী বন্ধুকে ওরা বর্বরের মতো হত্যা করেছে তখন নিজেজেই শেষ করে ফেলার ইচ্ছে হতো। কখনো ভাবতাম একটা পিস্তল নিয়ে বেরিয়ে পড়বো, যে বাধা দেবে তাকেই গুলি করবো। আমার রক্তের ভেতর তখন হত্যা করার এক দারুণ নেশা সারাক্ষণ তাড়া করে ফিরতো। আসলে তখন আমি পুরোপুরি একটা পশুতে পরিণত হয়েছিলাম।'

কথা বলতে বলতে দুলালদার মুখে যন্ত্রণায় নীল ছায়া ঘনিয়ে এলো। আমি বুঝলাম এসব কথা বলতে দুলালদার খুব কষ্ট হচ্ছে। রামু আর বিজু অসহায়ের মতো দুলালদার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলো। আমি বললাম, 'এখন থাক দুলালদা। পরে কখনো শুনবো।'

দুলালদা ম্লান হেসে মাথা নাড়লেন, 'এখন আর আমার কষ্ট হয় না। তখন হতো। এমন অনেক কথা আছে যা তোমাদের বলা যাবে না, অথচ কী ভয়ংকর যন্ত্রণায় স্মৃতি! আমাকে সারাক্ষণ রক্তাক্ত করতো। একজন মানুষের যন্ত্রণা কতখানি চরমে যেতে পারে সেই অভিজ্ঞতা আমার আছে।'

রামু বললো, 'এখন আপনাদের অবস্থা কী রকম দুলালদা?'

দুলালদা একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'এখনো পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আমার ছবি আছে পুলিশের কাছে। কলেজে থাকতে আমার দাড়ি ছিলো। এখন দাড়ি কেটে ফেললেও বেশিক্ষণ নিজেকে এক জায়গায় লুকিয়ে রাখা যায় না। চেরাপুঞ্জি ছিলাম দিন দশেক। পুলিশ টের পেয়ে গেলো। আজ রাতেই আমাকে ধরবার প্ল্যান করেছিল। তাই ভোর না হতেই সেখান থেকে পালিয়েছি। পার্টির যারা এখনো বেঁচে আছে তাদের অবস্থাও ঠিক আমার মতো। কোনও যোগাযোগ নেই। পার্টি ভেঙে কয়েকটা গ্রুপ হয়েছে। সবাই পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি। লেনিনের একটা কথা এতদিনে উপলব্ধি করছি— 'বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লব হয় না।'

বিজু বলল, 'আচ্ছা দুলালদা, পুলিস কি আপনাকে ধরার জন্যে এখানে আসতে পারে?'

দুলালদা মৃদু হেসে বললেন, 'পারে। তবে ওখানকার পুলিস নয়। এখানকার পুলিস পেলেও আমাকে হাজতে পুরে দেবে। আমাদের পুলিস যদি সন্দেহ করে আমি এদিকে এসেছি তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এখানকার পুলিসকে খবর দেবে। আমাদের পুলিসের চেয়ে তোমাদের পুলিসরা বিপ্লবীদের জন্য এতটুকু ভালো নয়, এ খবর আমার জানা আছে।'

আমি ভাবছিলাম চেরাপুঞ্জির কথা। পুলিস এতক্ষণে নিশ্চয়ই তন্নতন্ন করে দুলালকে খুঁজেছে। দুলালদা যদি টের না পেতেন তাহলে ঠিকই তিনি ধরা পড়ে যেতেন। ধরার পর দুলালদাকে নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলতো। আজ রাতে

আমরা ওঁকে আমাদের ঘরে না আনলেও ধরা পড়তে পারতেন। আজকাল মাঝেমাঝে রক্ষীবাহিনী আর বিডিআরেরা জাফলং ঘুরে যায়। তা ছাড়া পাহারাদার তো আছেই। ক'দিন আগে ওরা এক স্মাগলারকে ধরেছিলো। দুলালদাকে ওরা স্মাগলার সন্দেহ করেই ধরতো।

বাইরে মাঝে মাঝে দমকা বাতাস বইছিলো। পুরোপুরি শীত নামার আগে এখানে ঝড় হয়। ঝাউবনে বাতাসের শনশন শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। ঝড় আসার আগে এরকম এলোমেলা দমকা বাতাস বয়। জয়ন্তিয়া পাহাড় থেকে মাঝে মাঝে বুনো কুকুরের করুণ ডাক ভেসে আসছিলো। শীতের ঠিক আগে পাহাড়ি কুকুর দল বেঁধে করুণ গলায় ডাকতে থাকে। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তোলে সেই ডাক। বহু দূর পর্যন্ত শোনা যায়। কখনো ফেউয়ের ডাকও শোনা যায়। আমাদের খাসিয়া মালি দারুভূই বলে জয়ন্তিয়া পাহাড়ে নাকি বাঘও আছে।

রামু বলল, 'দুলালদা আপনি আমাদের এখানে থেকে যান। আমরা আপনাকে লুকিয়ে রাখবো।'

বুঝলাম আমার মতো রামুর মনটাও দুলালদার জন্যে খুব নরম হয়ে পড়েছে। ঠিক এই কথাটা আমিও বলতে চেয়েছিলাম।

দুলালদা হেসে বললেন, 'তাই কি কখনো হয়! আমাকে কাজ করতে হবে না?'

আমি বললাম, 'আপনি কোথায় কাজ করবেন?'

দুলালদা একটু ভেবে বললেন, 'আমি খাসিয়াদের ভেতর কাজ করতে চাই। পাঁচ বছর আগে আমি খাসিয়াদের গ্রামে কিছুদিন কাজ করেছিলাম।'

রামু বললো, 'তাহলে তো আপনাকে এখানে থাকতেই হচ্ছে। খাসিয়াদের ভেতর কাজ করার জন্যে এটাই সবচেয়ে ভালো জায়গা।'

দুলালদা বললেন, 'কাজ শুরু হলে আমি গ্রামে গিয়েই থাকবো। তবে গ্রামে যাবার আগে হয়তো আরো দু'একরাত এখানে থাকতে পারি; যদি তোমরা আমাকে আশ্রয় দাও।'

রামু খুশিতে উত্তেজিত হয়ে বললো, 'দু-তিনরাত কেন, দু-তিনমাস থাকুন না! আমরাও আপনার সঙ্গে কাজ করবো।'

দুলালদা হেসে বললেন, 'এখানে থেকে কাজ করলে তোমাদের সহযোগিতা আমার সব সময় দরকার হবে। এবার তোমরা শুয়ে পড়ো। রাত অনেক হলো। আমি ভোর হবার আগেই উঠতে চাই।'

শোবার কথা শুনে বিজু হাই তুললো। এত রাত অব্দি জেগে থাকার অভ্যেস নেই ওর। রামু শুতে শুতে বললো, 'আপনার ঘুম ভাঙলে আমাকেও উঠিয়ে দেবেন।

লাইট নিভিয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম। আমি অনেক রাত অব্দি টের

পেয়েছিলাম, দুলালদা ডিভানে বসে সিগারেট খাচ্ছেন। আমি ভাবছিলাম কী অদ্ভুত মানুষ এই দুলালদা। তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছে মাত্র সাতঘন্টা আগে। এরই ভেতর তিনি আমাদের চিন্তাভাবনা সবকিছু এলোমেলো করে দিয়েছেন। আমার মনে হলো, হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা আমাদের দুলালদাই দিতে পারবেন।

দিদা আর পচার মার আবিষ্কার

দুলালদা যখন রামুকে ডাকলেন, তখন আমারও ঘুম ভেঙে গেলো। তাকিয়ে দেখি দুলালদা যাওয়ার জন্যে তৈরি, আর রামু খাটে বসে চোখ কচলাচ্ছে। আমাকে দেখে দুলালদা বললেন, 'তুমিও উঠে গেছো নাকি! অনেক দেরি হয়ে গেলো। আমি ভেবেছিলাম রাত থাকতে বেরিয়ে পড়ব।'

দুলালদা জানালা খুলে দিয়েছেন। বাইরে তখন ভোর হয়ে গেছে। ঘন কুয়াশায় সবকিছু ঢাকা পড়েছে। আমি বললাম, 'এই কুয়াশায় কেউ রাস্তায় বেরোয় না দুলালদা। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন।'

রামু বললো, 'বিজু ঘুমোক। আবু, তুই আমাদের সঙ্গে চল্। ফেরার পথে আমি একা আসবো নাকি!'

আমি গরম মুজো পরতে পরতে বললাম, 'তুই না বললেও আমি যেতাম।'

দুলালদা বললেন, 'আমার ব্যাগটা তাহলে এখানে থাক। রাতে যখন ফিরবো তখন সঙ্গে বয়ে কী লাভ।'

তিনজন পা টিপে টিপে পেছনের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলাম। নোংরা আবর্জনা মাড়িয়ে নাকে রুমাল-চাপা দিয়ে রাস্তায় এসে উঠলাম। কোথাও কোনো লোকজন নেই। শীতে আমাদের দাঁতে দাঁত লেগে ঠকঠক শব্দ হচ্ছিলো। রাতে দেখেছি দুলালদার গায়ের নীল জ্যাকেটটার নিচে শুধু একটা শার্ট রয়েছে। পোড়খাওয়া শরীর একেই বলে। আমরা জামা, সোয়েটার, চাদর গায়ে দিয়েও রীতিমতো কাঁপছিলাম।

সোনিয়াদের বাড়ির চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। বুঝলাম ওদের নেপালি চাকরটার ঘুম ভেঙেছে। সোনিয়াদের বাঙলোটা কোনো এক সাদা চামড়ার

সায়েব বানিয়েছিলেন। ভদ্রলোকের দুটো চা-বাগান ছিলো। গরমের সময় এখানে থাকতেন। সোনিয়ার বাবা জয়ন্তিয়াপুরের এক বিশাল চা-বাগানের ম্যানেজার। সেজ কাকিমা সোনিয়াদের বাসায় মাঝেমাঝে বেড়াতে যান। সোনিয়ার মা হাসি খালার সঙ্গে তাঁর ভারি ভাব। একদিন সেজ কাকিমাকে বলতে শুনেছি, সোনিয়ার বাবা নাকি মেম বিয়ে করেছেন, নতুন বৌ নিয়ে তিনি বাগানে থাকেন। মাঝে মাঝে এসে সোনিয়াদের দেখে যান। আমাদের এক রত্তি শহরে হাসি খালা সবসময় এই কারণটির জন্যেই নিজেকে গুটিয়ে রাখেন। সেজ কাকিমারা পাড়ার মহিলাদের সঙ্গে এ-নিয়ে হাসাহাসিও করেন।

সোনিয়ার কথা দুলালদাকে কালই বলেছিলাম। ওদের বাড়িটা তাঁকে দেখিয়ে বললাম, 'এখানেই সোনিয়া থাকে ওর মায়ের সঙ্গে।'

সোনিয়াদের বাড়ি পেরিয়ে আমরা কমলা বাগানে ঢুকলাম। রামু হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে দুলালদাকে বলল, 'জানেন দুলালদা, এই কমলা বাগানটা পুরোটাই আমাদের। ক'দিন পরে আপনাকে চমৎকার কমলা খাওয়াতে পারবো।'

দুলালদা বললেন, 'ততদিন যদি থাকি নিশ্চয়ই খাবো।'

গাছের কমলাগুলো এখনো সবুজ। কিছুদিন পর রঙ ধরবে। তখন সারা বাগান আলো হয়ে যাবে। গাছ থেকে কমলা পাড়াটা তো রীতিমতো উৎসবের ব্যাপার। অনেক দূরে থেকে কমলার পাইকাররা আসে। দাদু বাগান বিক্রি করেন না।

বাগানের এক কোণে পাহারাদাররা আগুন পোহাচ্ছিলো। বুড়ো বনমালী চেঁচিয়ে বললো, 'কে যায়?'

রামুও চেঁচিয়ে জবাব দিলো 'আমরা।'

দুলালদা মৃদু হেসে বললেন, 'এটা কি কোনো জবাব হলো! আমরা তো সবাই বলতে পারে।'

রামু বলল, 'বনমালী, আমাদের চেনে।'

আমি বললাম, 'এখন আহ্লাদ দেখাবার জন্যে ও ছুটে না এলেই বাঁচি।'

বনমালী বলল, 'বেড়াতে বেরিয়েছো বুঝি। ভালো করেছো। ভোরবেলার বাতাস খুব তাজা থাকে।'

আমরা গতকাল যে জায়গাটায় বসেছিলাম সেখানে এসে দুলালদা বললেন, 'তোমাদের আর আসতে হবে না। বনমালীর হাত থেকে বেঁচে গেছি। একা এলে কী যে বিপদ হত!'

আমি হেসে বললাম, 'ওকে ধমক লাগালেই গুটিয়ে যেতো। তাছাড়া কখনো দেখা হলে আমাদের কথা বলবেন। ও আমাদের খুব ভালোবাসে।'

দুলালদা আমাদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন, 'চলি তাহলে। রাতে দেখা হবে।'

আমরা শুধু হাসলাম। দুলালদা লম্বা লম্বা পা ফেলে, কিছুক্ষণের মধ্যেই সামনের ঘন কুয়াশার সমুদ্রে ডুবে গেলেন। আমরা আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ির পথে পা বাড়ালাম।

সোনিয়ার বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তাকিয়ে দেখি সোনিয়া আর হাসি খালা জানালার ধারে বসে আছেন। হাসি খালা অন্যদিকে তাকিয়ে কী যেন করছিলেন।

সোনিয়া আমাদের দেখতে পেয়ে হেতে হাত নাড়লো। রামু অবাক হয়ে একবার সোনিয়ার দিকে, আরেকবার আমার দিকে তাকালো। খুশিতে আটখানা হয়ে আমিও হাত নাড়লাম।

রামু দারুণ উত্তেজিত হয়ে বললো, 'ও কি তো-তোকে হাত দেখালো?'

আমি মুখ টিপে হেসে নিস্পৃহ গলায় বললাম, নয়তো কি তোকে?'

রামু বললো, 'আমি কি তাই বলেছি! তুই লুকিয়ে ওর সঙ্গে ভাব জমিয়েছিস একথা তো আমাকে বলিস নি?'

আমি বললাম, 'তুই ওদের বাসায় গিয়েছিলি সে-কথাও তো আমাকে বলিস নি।'

রামু গোমড়া মুখে বললো, 'বারে আমাকে তো মেজ কাকিমা পাঠিয়েছিল হাসি খালার কাছে। আমি ওর সঙ্গে কথা বলেছি নাকি!'

আমি হেসে ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'তুই অত মুখ কালো করছিস কেন? তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।'

রামু মনে মনে খুশি হলেও মুখে বললো, 'থাক আমার জন্যে কাউকে বলতে হবে না। আমি নিজেই আলাপ করতে পারি।'

আমি বললাম, 'বেশ তাই করিস।'

রামু তক্ষুণি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, 'সত্যি বলছিস, আমার সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিবি?'

আমি হেসে বললাম, 'তাহলে আর বলছি কী! এখন ছাড় আমাকে। সুড়সুড়ি লাগছে।'

রামু আর কোনো কথা বললো না। ও বোধহয় এখন থেকেই ভাবতে শুরু করেছে, সোনিয়াকে কী বলবে। অচেনা মেয়ের সঙ্গে কথা বলার সময় রামুর কান-টান লাল হয়ে এমন এক অবস্থা হয় যে, সে দেখার মতো।

পাঁচিলের পাশ দিয়ে আমরা যখন খিড়কি দরজার দিকে যাচ্ছি তখন ঝপাৎ করে আমাদের গায়ে কী যেন পড়লো। চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি একগাদা শুকনো পাতা, ছেঁড়া কাগজ আর তরকারির খোসা। বুঝলাম পচার মার কান্ড। দুজন একসঙ্গে পাঁচিলের ওপাশে পচার মাকে ধমক দিতে গিয়ে সামলে নিলাম। ময়লা ঝেড়ে দৌড়ে উপরে উঠে হেসে বিছানায় গড়িয়ে পড়লাম।

আমাদের ওরকম হাসতে দেখে বিজু আবক হয়ে বললো, 'কী হলো তোদের? এরকম হাসছিস কেন?'

হাসতে হাসতে রামু পচার মার শুকনো রসিকতার কথা বিজুকে বললো। আমি বললাম, 'কীরকম চোরের মতো অবস্থা আমাদের দেখ। একফোঁটা চ্যাঁচানোর জো নেই। পাতার বদলে ও তো এক গামলা ঠাণ্ডা পানিও ঢেলে দিতে পারতো!'

আমরা যখন পচার মাকে নিয়ে হাসাহাসি করছি, ও তখন নিচে এক তুলকালাম কাণ্ড শুরু করে দিয়েছে। মুখ ধোয়ার জন্যে আমরা নিচে এসে শুনি কাল রাতে নাকি বাড়িতে চোর এসেছিলো। ভোর রাতে ও পাঁচিলের পাশে চোরের শব্দ শুনেছে। রাত থাকতে ও নাকি উঠোন ঝাড় দিয়েছে। ময়লা ফেলতে গিয়ে মনে হলো কারা যেন ধুপধাপ করে পালিয়ে যাচ্ছে। ও বাইরে এসে দেখে খিড়কি দরজা হা করে খোলা। পচার মার বানানো গল্প শুনে আমাদের মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেলো। ও যে এভাবে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে আমরা ভাবতেই পারি নি। এতদিন যে পচাকে এতকিছু খাইয়েছি সবই বিফলে গেলো!

পচার মা হাত-পা নেড়ে গল্প করছিলো। জেঠিমা, মা, সেজ কাকিমা, ছোট কাকিমা সবশেষে দিদা প্রত্যেককে আলাদাভাবে গল্প শোনালো। প্রত্যেকবারই গল্পের সঙ্গে নতুন কিছু যোগ করলো। দিদাকে বলার সময় বললো, 'চোর নয় মা, ডাকাত। যে রকম ধুপধাপ পায়ের শব্দ শুনলাম মনে হল দল বেঁধে এসেছে। চোর কি কখনো দল বেঁধে আসে ? আমি বেরুতে না বেরুতে আমার চোখের সামনে দিয়ে সব কটা কর্পূরের মতো উবে গেলো। মা তো জানেনই, রাতে আমি চোখে ভালো ঠাহর করতে পারি না। নইলে ঠিকই পিছু নিতাম।'

যে পচার মা আরশোলা দেখলে হুলস্থুল কাণ্ড ঘটায় সে ডাকাতের পিছু নেবে, এরকম একটা হাসির কথা শুনেও জেঠিমা, মা, কাকিমার কেউ হাসলেন না। হাসবেন কি, তাঁরা যে পচার মার সব কথা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করে বসে আছেন! ওঁদের সবার গুরুগম্ভীর মুখ দেখে আমরাও হাসতে পারছিলাম না। বুকের ভেতর ঢিবঢিব করা সত্ত্বেও হাসিতে আমাদের পেট ফুলে ঢাক হয়ে গিয়েছিলো।

দিদা বললেন, 'তুই রাতকানা বলেই তো তোকে সন্দেহ হচ্ছে পচার মা। রাতের বেলা কুকুর না ভাম দেখেছিস, তাই নিয়ে গোটা বাড়ি মাথার তুলেছিস। যা বাছা, চুলোয় আগুন ধরাগে।'

পচার মার ওঠার নাম নেই। হাত নেড়ে বললো, 'সে কি মা, রাত কোথায়! তখন যে ফরসা হয়ে গেছে। আমি নিজ কানে পায়ের শব্দ শনেছি। কুকুর কি খিড়কি দরজা খুলতে পারে?'

দিদা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'মুরুব্বিদের সামনে হাত নেড়ে কথা বলতে তোকে বারণ করি নি? খিড়কি দরজা বন্ধ ছিলো এ-কথাই বা তোকে কে বললো? কবে কে ছিটকিনি লাগাতে ভুলে গেছে, এদ্দিন চোখে পড়ে নি।' এই

কথা বলে দিদা আড়চোখে আমাদের দিকে তাকালেন।

আমি ঢোক গিলে রামুর দিকে তাকালাম। ও দেখি একবারে সাদা হয়ে গেছে।

দিদা মুখ টিপে হেসে বললেন, 'তোকেও বলি পচার মা, বানিয়ে গপ্পো বলার সময় তোর কোনো হুঁশ থাকে না। আমাকে একবার বললি তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার, আবার এখন বলছিস ফরসা হয়ে গেছে। এত উল্টো-পাল্টা বলে কি গপ্পো বানানো যায়। নে ওঠ, অনেক হয়েছে।'

বাড়িতে ডাকাত পড়ার দারুণ উত্তেজনাময় গরম গল্পটির ওপর দিদা যেভাবে ঠান্ডা পানি ঢেলে দিলেন, পচার মা তাতে চুপসে গিয়ে ভেজা বেড়ালটির মতো রান্নাঘরে ঢুকলো। ওর এরকম চুপসে যাওয়াটা জেঠিমারা পছন্দ করেন নি। রামুর ওপর চোখ পড়তে আমাদেরকে নিয়ে পড়লেন— 'তোরা ছাড়া আর কে খিড়কি দরজা খুলতে যাবে হতচ্ছাড়ার দল। চোর আসে নি, আসতে কতক্ষণ, এরকম দরজা খোলা দেখলে চুরি করার জন্যে সবার হাতই চুলবুল করবে।'

দিদা বললেন, 'মুখ না ধুয়ে তোরা বুঝি মুরুব্বিদের কথা গিলছিস? শিগগির পালা সামনে থেকে।'

বুঝলাম দিদা এবারও আমাদের জেঠিমার বকুনির হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন। দিদার জন্যে ঠিক এজন্যই আমাদের মন সারাক্ষণ কৃতজ্ঞতায় ভরে থাকে। গরম পানির জন্যে অপেক্ষা না করে ঠাণ্ডা পানিতে মুখ ধুয়ে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে আমরা উপরে চলে গেলাম। পচার মা এমন এক অভাবনীয় আবিষ্কারের উত্তেজনায় আমাদের মুখ ধোয়ার পানি গরম করতেও ভুলে গিয়েছিলো। ঘরে ঢুকে তিনজন আবার দম ফাটানো হাসিতে বিছানায় গড়িয়ে পড়লাম।

সকালে আমরা যখন নাস্তা খাওয়ার জন্যে নিচে নামলাম তখন দেখি পচার মা সেজ কাকিমাকে রান্নাঘরে একা পেয়ে তাঁকে বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে।' কাকিমাও পরম নিশ্চিন্তে খোলাজাই পিঠে বানাতে বানাতে পচার মার আজগুবি গল্প গোগ্রাসে গিলছিলেন। খেতে বসে আমি বললাম, 'দিদা তো পচার মার কথা হেসেই উড়িয়ে দিলো। ডাকাত না আসুক চোর আসাটা তো অসম্ভব কিছু নয়। কিছু নেয় নি বলেই যে ধরে নিতে হবে চোর আসে নি এটা তো হতে পারে না। চোর সাধারণত শেষ রাতেই আসে। পচার মা টের পেয়েছিলো বলেই চুরির করতে পারে নি।'

আমার কথা শুনে রামু মুখ টিপে হাসলো। বিজু হাসি চাপতে গিয়ে খুক করে কাশলো। পচার মা আহ্লাদে আটখানা হয়ে পান-খাওয়া কালো দাঁত সব কটা বের করে বললো, 'তবেই দেখ। সাধেই কি তোমরা পরীক্ষায় ফাস সেকেন হও! তোমাদের মাথা কী পরিষ্কার! অথচ মা বলেন কিনা সব আমার বানানো গপ্পো।

অ সেজদিদিমণি, ছেলেরা শুধু চিনি দিয়ে পিঠে খাচ্ছে যে, ওদের একটু নারকোল কুরে দেব?'

সেজ কাকিমা হাসি চেপে বললেন, 'দাও! তখন যে বললে নারকোল কোরাতে পারবে না, তোমার কুনুই ব্যথা করছে?'

পচার মা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো, 'আহা তাই বলে বাড়িসুদ্ধ সবার জন্যে নারকোল কোরাতে বসলে তো কুনুইয়ে ব্যথা করবেই। তুমি হুকুম করো তো ব্যথা নিয়েই কুরে দেই।'

সেজ কাকিমা বললেন, 'বাবা আর বড়দার খাওয়া হয়ে গেছে। এখন আর সবাইকে দিয়ে কাজ নেই। তুমি বরং এদেরই দাও।'

দিদা এসে আমাদের নারকেল খেতে দেখে একগাল হেসে বললেন, 'তোদের নারকোল দিল কে রে? আমিই তো বলতে এসেছিলাম।'

পচার মা সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'আপনিই তো বলেন মা, উঠতি বয়সের ছেলেদের একটু ভালো খেতে দিতে হয়। তাই আমি সেজদিদিমণিকে বলতেই তিনি কুরে দিতে বললেন।'

দিদা হেসে বললেন, 'ভালো করেছিস। যা তোকে মিথ্যে গপ্পো বলার জন্যে মাপ করে দিলাম। বৌমা, তোমার শ্বশুরকে আদা দিয়ে চা দিও। ওঁর ঠাণ্ডা লেগেছে।'

খেয়ে উঠে বিছানায় গড়ানো ছাড়া আমাদের কোনো কাজ ছিলো না। দুলালদাকে কীভাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এ-সম্পর্কে বিজু রামুর কাছ থেকে সব জেনে নিলো। আমি বললাম, 'দুলালদা এতক্ষণে খাসিয়াদের গ্রামে পৌঁছে গেছেন।'

রামু হঠাৎ জিভ কামড়ে বললো, 'কী রকম এক ভুল করে বসেছি দেখেছিস?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কী ভুল?'

'দুলালদা সকালে নাস্তা করবে কী দিয়ে? তাঁকে কিছু খাবার সঙ্গে দেয়া উচিত ছিলো। জয়ন্তিয়া পাহাড়ে নিশ্চয়ই ওঁর জন্যে কেউ রেস্টুরেন্ট খোলে নি।'

আমি হেসে বললাম, 'তাতে কী? জয়ন্তিয়া পাহাড়ে তো খাসিয়ারা আছে। দারুভূই বলেছে ওদের গ্রামে কোনো অতিথি গেলে নাকি ওরা খুব যত্ন করে। দুলালদার কোনো অসুবিধা হবে না।'

এমন সময়— 'কার অসুবিধা হবে না বললি?' বলে দিদা ঘরে ঢুকলেন। ঘরের ভিতরে যেন বাজ পড়লো। আমরা তিনজন দারুণ রকম চমকে উঠে ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। দিদা নিঘাত আমাদের সব কথা শুনে ফেলেছেন।

আমাদের বিছানায় এককোণে বসে পান চিবোতে চিবোতে দিদা মুচকি হেসে বললেন, 'হ্যাঁরে আবু, রামু! সাতসকালে তোরা খিড়কি দরজা দিয়ে কাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলি?'

রামু একবার আমার দিকে তাকালো। আমি রামুর দিকে তাকালাম। দিদা বললেন, 'তোরা আমার কাছে কিছু লুকোবি না। দুপুরে হাঁড়ি-কাবাব খেতে চাইলে এক্ষুণি সব বলে ফেল্। আমি দোতলার জানালা দিয়ে সব দেখেছি।'

দিদা এমনভাবে কথাগুলো বললেন যে তাঁর কাছ কিছু লুকোতে মোটেই ইচ্ছে হলো না। গত সন্ধ্যের পর থেকে যা যা ঘটেছে সব তাঁকে খুলে বললাম। দুলালদার মা মারা যাওয়ার কথা শুনে দিদার চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। বললেন, 'অত ফেনিয়ে বলছিস কেন? তাড়াতাড়ি শেষ কর। তারপর আমি একটু কাঁদব। তোরা আমাকে কুটুর কথা মনে করিয়ে দিলি। হারামজাদাকে আমি কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি।'

কুটু মানে আমাদের বড়দা। তাঁর জন্যে যে দিদা সবচেয়ে বেশি ভাবেন এটা বাড়ির কারো অজানা নয়। তবে দিদার মতো দারুণ রাগী একজন, যাঁকে বাড়ির সবাই সমীহ করে, তিনি একজন অচেনা ছেলের জন্যে কাঁদছেন—আমরা ছাড়া তাঁর এই ফুলের মতো নরম মনটির কথা কেউ জানবে না।

দিদা সব শুনে বললেন, 'ভালো করেছিস। আমি জানি এ বাড়িতে শুধু তোরাই আমার মতো হয়েছিস। আর সব কটা হচ্ছে চামার, পয়সা ছাড়া কিছুই চেনে না। তবে যাই বলিস বাছা, তোরা আগুন নিয়ে খেলছিস। একটু অসাবধান হলে সবাইকে মারবি। ওই ছোঁড়া যদি আজ রাতে আসে আমাকে খবর দিস। ওর চেহারা দেখেই আমার কুটুর কথা মনে হয়েছে। যেজন্যে পচার মাকে হাঙ্গামা করতে দেই নি। তোদের দাদুর কানে গেলে তিনি থানা-পুলিশ করে একাকার করতেন।'

দিদা উঠে যাওয়ার সময় মুচকি হেসে বলে গেলেন, 'তবে তোদের জন্যেও আমার কপালে দুঃখ আছে, এ কথা তোরা লিখে রাখতে পারিস।'

আমাদের মস্ত বড় পরিবারে যেখানে দাদু, জেঠু, কাকা সবার সঙ্গে আমরা একত্রে থাকি সেখানে কেউ কারো দিকে সেরকম মনোযোগ দিতে পারে না। একমাত্র দিদাই সবার ভালোমন্দের খোঁজ নেন। সবাইকে ধমক দেন। আবার সবার জন্যে ভাবেনও। দিদা শুধু এবাড়ির লোকদের জন্যেই ভাবেন না। জাফলং-এর সবার সঙ্গেই দিদা ভাব জমিয়ে ফেলেছেন। কারো কোনো অসুবিধা হলে দিদার পরামর্শ নিতেই হবে। শুধু হাসি খালার সঙ্গে কেন জানি না দিদা এখনো আলাপ করেন নি। দিদা যদি ওঁকে এড়িয়ে না চলতেন তাহলে সোনিয়ার সঙ্গে অনেক আগেই ভাব জমাতে পারতাম। আমরা জানি এ নিয়ে দিদাকে কোনো প্রশ্ন করলে তিনি বিরক্ত হবেন। তাঁর পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে কারো নাক গলানো তিনি মোটেই ভালোবাসেন না।

বাবা, সেজকা আর মেজদা তাদের কাজের জন্যে বাইরে থাকেন। বাবা কাজ করেন ছাতকের সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে, সেজকা সুনামগঞ্জের এক কলেজে পড়ান।

আর মেজদা ঢাকায় বসে ছবি বানান। সিনেমা হলে মেজদার ছবি এলে আমরা সিলেটে গিয়ে দেখি। আমাদের জেঠিমা, মা আর কাকিমারা সারাদিন সংসারের কাজে এত ব্যস্ত থাকেন যে তাদের সঙ্গে বহুদিন কথাও হয় না। দিদা না থাকলে নয়নতারা কুটিরটা আমাদের কাছে মরুভূমি হতে যেতো।

সোনিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব

বিকেল পর্যন্ত আমরা চিলেকোঠার ঘরে দুলালদাকে নিয়ে গল্প করে কাটিয়ে দিলাম। মাঝখানে শুধু হাঁড়ি-কাবাব খাবার জন্য একবার নিচে নেমেছিলাম। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম দুলালদা একদিনে আমাদের বয়স আর অভিজ্ঞতা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। মনে হলো আমরা আর ছোট্টটি নেই, যাদের যখন তখন কান টানা যায়, চোখ পাকিয়ে ধমক দেওয়া যায় কিংবা চুলের ঝুঁটি ধরা যায়। বিজু পর্যন্ত এমন সব কথা বলেছিলো যা আগে কখনো ওর মুখে শুনি নি। তেরো-চৌদ্দ বছর বয়সে হঠাৎ কেন সবাই বড় হয়ে যায় কথাটা এদ্দিনে আমার বোধগম্য হলো। যে কথা রামু বিজুকে আগে কখনো বলি নি, অকপটে সব বলে ফেললাম। রামু এমন অনেক কথা বললো, যা শুনে কখনো রোমাঞ্চিত হলাম কখনো বা বিস্মিত হলাম।

বিকালে কমলালেবুর বাগানে বসে আমরা অনর্গল কথা বলছিলাম। এত কথা আমাদের বুকের ভিতর জমেছিলো যে ভেবে রীতিমতো অবাক হলাম। সব কথা বলার পর নিজেদের খুব পবিত্র মনে হলো। আমি চিৎ হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়েছিলাম। আমরা চাদর না এনে শুধু সুয়েটার পরেছি। দুলালদা একটা জ্যাকেট পরে যদি শীত কাটাতে পারেন, আমরা কেন এতগুলো পরব ভেবে পেলাম না। দুলালদা আমাদের সাহস অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন।

বিজু বললো, 'কাল এতক্ষণে এখানে বসে হারিয়ে যাওয়ার জন্যে কী দুঃখটাই না করছিলাম!'

রামু বললো, 'ওসব কথা ভাবতেও আমার হাসি পাচ্ছে। দুলালদার সঙ্গে কী কাজ করা যায় আবু কিছু ভেবেছিস?

আমি বললাম, 'ভাববার কী আছে। দুলালদা আমাদের যা বলবেন তাই করবো।'

বিজু একটু পরে বললো, 'আমার মনে হচ্ছে আমি দারুণ একটা কিছু করে ফেলতে পারবো।'

রামু বললো, 'ওরকম ইচ্ছে সবারই হয়। এ আর নতুন কী!'

রামুর কথা শুনে আমি একটুও অবাক হলাম না। অথচ কাল যদি ওর মুখে এ ধরনের কথা শুনতাম তাহলে আমি নির্ঘাত হেসে খুন হতাম।

কিছুক্ষণ পর বিজু বললো, রামু তুই বড় হলে কী হবি?'

রামু শান্ত গলায় বললো, 'বড়দা আর দুলালদার মতো হবো।'

বিজু আস্তেআস্তে বললো, 'আমিও তাই ভাবছিলাম।'

আমি ওদের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললাম। বললাম, 'অত ভাববার কিছুই নেই। আমরা তিনজনই বিপ্লবী হবো।'

এমন সময় 'এই যে ত্রিরত্ন' — বলে সোনিয়া এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালো। 'ঠিক যা ভেবেছিলাম তাই।'

আমি হেসে বললাম, 'কী ভেবেছিলি?'

'তোদের তিনজনকেই এখানে পাবো। আমার ধারণা অবশ্য ভুলও হতে পারত।'

আমি হেসে বললাম, 'তুই তাহলে বসে পড়।'

রামু আর বিজু অবাক হয়ে একবার সোনিয়া আরেকবার আমাকে দেখছিলো। বিজু আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করলো, 'তুই কি ওকে তুই বলিস নাকি!'

সোনিয়া হেসে গুঁড়ো হয়ে গেলো। বললো, 'তবে কি আপনি বলবো! বিজুকে অবশ্য দেখতে যেরকম বাচ্চা মনে হয় তাতে ও যদি আমাকে আপনি বলে আমি কিছু মনে করবো না। অবশ্য এখানে ইশকুলে ভর্তি হলে আমাকে ওর এক ক্লাশে ওপরে পড়তে হত।'

সোনিয়ার কথাগুলো পাহাড়ি ঝর্নার মতো সুন্দর আর মিষ্টি। আমি সারাজীবন কান পেতে ওর কথা শুনতে রাজি আছি। সোনিয়া আমার পাশে ঘাসের ওপর বসে পড়লো— 'মা বলেছে আজ বিকেলে তোমাদের তিনজনকে আমাদের বাড়িতে চা খেতে। অবশ্য এর মধ্যে যদি চা খাওয়া না হয়ে থাকে।'

আমি আগেও লক্ষ্য করেছি সোনিয়া বলার মাঝখানে একটা 'অবশ্য' জুড়ে দেবে। যে জন্যে ওর বাক্যগুলো একটু লম্বা হয়ে যায়। ঝর্নার মিষ্টি শব্দ শোনার জন্য আমি তো চাই ও কথা বলার সময় আরো লম্বা বাক্য ব্যবহার করুক। সোনিয়াকে বললাম, 'নেমন্তন্ন করতে এলি যখন একটু বসে যা। এখানে আর তোকে কী খেতে দেব বল্! কমলা পাকলে না হয় কটা পেড়ে দিতাম।'

সোনিয়া বললো, 'সত্যি বলছিস্! আমি কতদিন ভেবেছি কমলায় রঙ ধরলে তোদের বাগানে আসবো। অবশ্য তোদের যদি আপত্তি না থাকে।'

রামু বললো, 'আপত্তি থাকবে কেন। তুই যদি রোজ এখানে বেড়াতে আসিস, তাহলে আমরা আরো খুশি হবো।'

সোনিয়া হেসে বললো, 'যাক, শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে রামু কথা বললো। তো ডাঁট দেখে তো ভেবেছিলাম আমার সঙ্গে বুঝি কথাই বলবি না। অবশ্য ফার্স্ট হলে সবাই একটু ডাঁট দেখায়।'

'মোটেই না।' রামু তড়বড় করে বললো, 'তুই আবুকে জিজ্ঞেস কর। আমি কক্ষনো ডাঁট দেখাই না।'

আমি বললাম, 'ও ঠিকই বলেছে সোনিয়া। রামু ধরেই নিয়েছে ও বরাবর ফার্স্ট হবে, যেহেতু আমি সেকেন্ড হবো। সেজন্যে ফার্স্ট হওয়াটাকে খুবই মামুলি কিছু মনে করে।'

সোনিয়া বললো, 'ওটা তো আরো বেশি অহংকারের কথা হলো। ইশকুলে অবশ্য আমিও ফার্স্ট হতাম। তবে রামুর মতো সবসময় ফার্স্ট প্লেসটাকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকতাম না। মাঝে মাঝে সেকেন্ডও হতাম।'

রামু বললো, 'তোদের ওখানে নিশ্চয়ই কম্পিটিশন ছিলো। আমি কী কবর বল্। আবু যে কখনো ফার্স্ট হতে চাইবে না।'

আমি রামুকে বললাম, 'স্বীকার করছিস তাহলে আমারই জন্যে তুই ফার্স্ট হচ্ছিস। যাক, তুই ফার্স্ট হলেই আমি খুশি। আমি চাই না খালেদ কিংবা পরেশ তোর জায়গাটা দখল করুক।'

সোনিয়া হেসে বললো, 'তোরা তিনজন আছিস বেশ। দেখলেও হিংসে হয়। আগে আমরা যেখানে থাকতাম সেখানে অবশ্য আমার অনেক বন্ধু ছিলো।'

আমি বললাম, 'এখানে আমরাই তোর বন্ধু! অন্য কারো সঙ্গে তোর বন্ধুত্ব হলে এক হাত দেখে নেবো।'

সোনিয়া চোখ কপালে তুলে বললো, 'ইংরেজি ছবির মতো ডুয়েল লড়বি নাকি! তাহলে অবশ্য তোদের একটা পুরোনো দিনের পিস্তল থাকতে হবে।'

আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, 'দরকার হলে পুরোনো দিনের একটা পিস্তল খুঁজে বের করা কঠিন হবে না।'

সোনিয়া পাহাড়ি ঝর্নার মতো হাসলো। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে বললো, 'চল্ দেরি হয়ে যাচ্ছে। মা চা নিয়ে বসে আছেন। মা অবশ্য তোদের সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলাপ করবেন। না না, আমার কাছে জানতে চাসনে। মার কাছ থেকেই শুনিস।'

আমরা তিনজনই একটু অবাক হলাম। আমাদের সঙ্গে হাসি খালার কী গুরুত্বপূর্ণ কথা থাকতে পারে ভেবে পেলাম না। কথাটার গুরুত্ব কমে যাবে বলে

সোনিয়াকেও এ-প্রসঙ্গে আর কোনো প্রশ্ন করলাম না। সোনিয়াদের বাড়ি যাওয়ার পথে কেউ কোনো কথা না বলে সবাই চুপচাপ হাঁটলাম।

হাসি খালা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। গেট দিয়ে আমাদের ঢুকতে দেখে নেমে এলেন। ঘাসের কার্পেটে ঢাকা সবুজ লনে সাদা রং-করা বেতের চেয়ার টেবিল পাতা ছিলো। হাসি খালা বললেন, 'তোমাদের এত দেরি হলো যে? চলো লনে বসি।'

রামু একবার সোনিয়ার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, 'আমরা বাগানে বসে গল্প করছিলাম।'

হাসি খালাকে আমাদের মা, কাকিমা, জেঠিমা কারো সঙ্গে মেলানো যাবে না। তাঁকে বাড়ির কোনো কাজ করতে হয় না। সবসময় সাদা সুতোর কাজ করা ধবধবে সাদা শাড়ি পরে থাকেন। চোখে তারের মতো সরু কালো ফ্রেমের চশমা। কাচ দুটো বেশ ভারি। মেজ জেঠিমার চেয়েও তাঁর বয়স বেশি হবে। তাঁর চেহারায় সারাক্ষণ একটা কোমল দুঃখের ছায়া ভেসে বেড়ায়। চুলে রুপোলি রঙের ছোঁয়া লাগলেও হাসি খালাকে এখনো অপরূপ সুন্দরী মনে হয়। সোনিয়া ওঁর মতো অতটা ফর্সা নয়। স্বভাব পেয়েছে মার একেবারে উল্টোটি। সোনিয়া যেমন বেশি কথা বলে, হাসি খালা কথাই বলেন না।

হাসি খালা ড্রাগনের নকশাকাটা চায়ের পেয়ালার সবুজ চা ঢাললেন। মিষ্টি গন্ধে যেন সারা লন ভরে গেল। রামু চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললো, 'এত সুন্দর চা আমি জীবনেও খাই নি।'

হাসি খালা মৃদু হেসে বললেন, 'আমাদের বাগানের চা।'

সোনিয়া বললো, 'তোদের আমি কিছু সবুজ চায়ের পাতা উপহার দিতে পারি। অবশ্য নিতে যদি তোদের আপত্তি না থাকে।'

আমি বললাম, 'কমলার বদলে নাকি!'

সোনিয়া লজ্জা পেয়ে বললো, 'বারে তা কেন—'

লজ্জা পেলে কাউকে যে সুন্দর দেখায়—এতদিন কথাটা শুধু বাংলা উপন্যাসেই পড়েছি। সোনিয়া এত লজ্জা পেলো যে, কথা বলা শেষ করতে পারলো না।

নরম ঘাসের সবুজ কার্পেটে তখন কমলা রঙের হালকা রোদ এখানে-সেখানে ছড়িয়েছিলো। সরল ইউক্যালিপ্টাস গাছের ধূসর ছায়া সবুজের ভেতর নকশার মতো শুয়ে আছে। শীতের শেষ বিকেলের রোদের চেয়ে মিষ্টি আর কিছু হয় না। সারা শরীর দিয়ে রোদের কোমল তাপ শুষে নিতে ইচ্ছে করে। সোনিয়ার মতো মেয়ে যদি পাশে থাকে তাহলে তো ইচ্ছে হয় মনের সুখে মরেই যাই!

হাসি খালা সোয়েটার বুনছিলেন। তাঁর কোলের ওপর জলপাই রঙের উলের বল আর একটুখানি বোনা সোয়েটার আলতোভাবে পড়েছিলো। হাসি খালা উল বুনতে বুনতে উদাস হয়ে যাচ্ছিলেন। উলের কাঁটা ধরা তার হাতের সুন্দর

আঙুলগুলো নাচের মুদ্রায় কখনো থেমে যাচ্ছিলো। হাসি খালা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আজ সকালে তুমি আর রামু এদিক দিয়ে কাকে নিয়ে যাচ্ছিলে?'

আমি চমকে উঠলাম। হাসি খালা কী করে টের পেলেন? আমার চোখে প্রশ্ন দেখে হাসি খালা মৃদু হেসে বললেন, 'সকালে তোমাদের আমি যেতে দেখেছি। তোমরা হয়তো ঘরের ভেতর আমাকে দেখতে পাও নি।'

রামু বললো, 'ওঁর কথা কাউকে বলতে তিনি বারণ করে গেছেন।'

রামুর কথা শুনে হাসি খালা দুঃখ পেলেন। চশমার ভারি কাচের ভেতর তাঁর চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। আস্তে আস্তে বললেন, 'ওকে দেখে আমার ছেলে অয়নের কথা মনে পড়ে গিয়েছিলো।' একটু থেমে হাসি খালা আবার বললেন, 'অয়নের শেষ চিঠি পেয়েছি তিনমাস আগে।'

আমি বললাম, 'হাসি খালা, আপনাকে কথা দিতে হবে দুলালদার কথা আপনি কাউকে বলবেন না।'

হাসি খালা মৃদু হেসে বললেন, 'আমাকে কি সেরকম ছেলেমানুষ মনে হয়!'

'ঠিক তা নয় হাসি খালা। কথাটা আমরা মা, কাকিমা, জেঠিমা কাউকেই বলি নি।'

আমি বললাম, 'দুলালদার সঙ্গে গতকাল ঠিক এরকম সময়ে আমাদের দেখা হয়েছিলো।'

আমার কেন যেন মনে হয়েছিলো, দুলালদার কথা শুনতে পেলে হাসি খালা কিছুটা হালকা বোধ করবেন। রাজনীতির তত্ত্বকথায় বেশি না গিয়ে দুলালদার সব কথা তাঁকে খুলে বললাম।

হাসি খালাকে কাঁদতে দেখে আমি একটুও অবাক হই নি। দুলালদার মতো হাসি খালার একটি ছেলে আছে, যে অনেক দূরে থাকে। দুলালদা মাকে ভালোবাসতেন বলেই দেশের জন্যে সব কিছু ত্যাগ করতে পেরেছেন। সব শোনার পর হাসি খালা না কাঁদলেই বরং আমি কিছুটা অবাক হতাম। দুলালদার বাবা তাঁর মাকে কষ্ট দিয়েছেন। আমি জানি সোনিয়ার বাবার জন্যে হাসি খালার দুঃখ এতটুকু কম নয়।

আমরা কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। হাসি খালা চশমা খুলে হাল্কা সাদা রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন। সোনিয়াও খুব গম্ভীর হয়ে বসেছিলো। হাসি খালা আবার উল বোনা শুরু করলেন। অনেকক্ষণ পরে বললেন, 'দুলাল যদি কিছু মনে না করে তাহলে ওকে আমার এখানে থাকতে বলতে পারো।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে হাসি খালা, দুলালদা এলে বলবো খন।'

হাসি খালা যে দুলালদার কথা কাউকে বলবেন না এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। একবার মনে হল দুলালদার কথা সোনিয়ার সামনে বলা উচিত হয় নি।

ও ছেলেমানুষ, কখন কার সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে বলে ফেলবে, তখন আমাদের বারোটা বাজবে। হাসি খালাকে বললাম, 'সোনিয়া আবার এসব কথা কাউকে বলে দেবে না তো!'

কথাটা শুনে সোনিয়া আমার দিকে এমনভাবে তাকালো— দেখে মনে হল এক্ষুণি বুঝি ও কেঁদে ফেলবে। হাসি খালা মৃদু হেসে সোনিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সোনিয়া আমার মেয়ে।'

সোনিয়াদের সবুজ লনে ধীরে ধীরে অন্ধকার নামলো। পশ্চিমের আকাশে তখন গোলাপি, কমলা আর বেগুনি রঙের মেঘ বিশাল প্রজাপতি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখিদের এলোমেলো ডাক শুনে মনে হলো কোথায় যেন জলতরঙ্গ বাজছে।

হাসি খালা বললেন, 'তোমরা আমাদের বাসায় আসো না কেন? মাঝে মাঝে শুধু বিজুর মা আসেন বেড়াতে।'

রামু বললো, 'এবার আর আসতে ভুল হবে না। রোজ বিকেলে আপনার কাছে এসে সবুজ চা খেয়ে যাবো।'

মৃদু হেসে হাসি খালা বললেন, 'তোমরা এলে আমার ভালো লাগবে। সোনিয়া বেচারী সারাদিন একা সময় কাটায়।'

আমি মনে মনে বললাম, 'আপনি কিছু মনে না করলে সোনিয়ার সঙ্গে সারাদিন কাটাতে আমার একটুও আপত্তি হবে না।'

বিজু বলল, 'বাসায় যাবি না? সন্ধ্যে হয়ে গেছে।'

আমি হাসি খালাকে বললাম, 'আজ তাহলে উঠি। কাল আবার আসবো।'

হাসি খালা বললেন, 'এসো।'

সোনিয়া আমাদের সঙ্গে গেট পর্যন্ত এলো। রামু আর বিজু একটু সামনে হাঁটছিলো। সোনিয়া আমার কানের কাছে মুখ এনে বললো, 'তুই কেন মাকে এরকম কথা বললি? আমাকে কি তুই বিশ্বাস করিস না? আমার তখন কী যে কান্না পাচ্ছিলো!'

সোনিয়ার কথা বলার সময় আমার মুখে ওর রেশমের মতো নরোম চুলের ছোঁয়া লেগেছিলো। মনে হল আমি যেন গোলাপের পাপড়িতে পা ডুবিয়ে হাঁটছি। ফিস্‌ফিস্ করে বললাম, 'তুই আমাকে বিশ্বাস করিস তো সোনিয়া? তাহলে আর কখনো খারাপ লাগবে না।'

গোলাপের মিষ্টি গন্ধে আমার বুকটা ভরে গেলো।

বিপ্লবীদের জন্য দিদার সহানুভূতি

বাড়ি ফেরার পথে বিজু আর রামু হাসি খালাকে নিয়ে গল্প করছিলো। বিজু বললো, 'হাসি খালা কী চমৎকার ফ্রুট পুডিং বানিয়েছে দেখেছিস! এখনো আমার জিভে স্বাদ লেগে আছে।'

রামু বলল, 'হাসি খালা এখনো দেখতে কী সুন্দর! দেখে মনে হয়, ছোট কাকিমার বয়সী।'

আমি চুপচাপ হাঁটতে হাঁটতে সোনিয়ার কথা ভাবছিলাম। ওর রেশমের মতো নরম চুলের ছোঁয়া, গোলাপের মতো মিষ্টি গন্ধ, কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে কথা বলা, সবকিছু মিলিয়ে আমি যেন রূপকথার কোনো জগতে চলে গিয়েছিলাম।

রামু আমার কাছে এসে বললো, 'সোনিয়া কিন্তু তোকেই পছন্দ করেছে। আমি দেখেছি বারবার ও আড়চোখে তোকে দেখছিলো।'

আমার জামাটা বুকের কাছে যেন ছোট হয়ে গেলো। আহ্লাদে গলে গিয়ে রামুকে বললাম, 'এখনো কিছু বলা যায় না। তুই যে আমার চেয়ে হ্যান্ডসাম এটা সবাই জানে।'

রামু সরলভাবে বলল, 'কিন্তু আমি যে কথা বলতে পারি না।'

'এখন না পারলে পরে পারবি। অনেকে বেশি কথা বলা পছন্দ করে না।'

'সোনিয়া কিন্তু বেশি কথা বলে।'

'আমার কাছে ওর বেশি কথা বলা ভালো লাগে।'

রামু হেসে বললো, 'তোর কাছে তো ওর সবই ভালো লাগবে।'

বিজু বললো, 'দুলালদা নিশ্চয়ই হাসি খালার কথা শুনে অবাক হয়ে যাবেন।'

দুলালদার কথা শুনে আমি স্বপ্ন থেকে বাস্তবে ফিরে এলাম। বললাম, 'দুলালদার ফিরতে নটা-দশটা বাজতে পারে। কালকের মতো খাবার ওপরে নিয়ে যেতে হবে।'

রামু বললো, 'পচার মা ভালো করে খিড়কি দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।'

আমি বললাম, 'তাতে কী? লোহার সিঁড়ি দিয়ে নেমে খুলে রাখলেই হবে।'

বাড়িতে ফিরতেই দিদা বললেন, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলি? পল্টুর চিঠি এসেছে।

ঘরদোর সব গোছাতে হবে। অথচ তোরা সেই দুপুরের পর থেকে বাতাসে মিলিয়ে গেছিস।'

আমি বললাম, 'হাসি খালার ওখানে আমাদের চায়ের নেমন্তন্ন ছিলো। মেজদা কী লিখেছে চিঠিতে? ঘর গোছাতে হবে কেন?'

দিদা একগাল হেসে বললেন, 'পল্টু আসছে যে! কবে চিঠি লিখেছে। সেই চিঠি পেলাম আজ দুপুরে। ও দলবল নিয়ে আসছে। এখানে নাকি ছবির সুটিং করবে।'

আমরা জীবনে কখনো ছবির সুটিং দেখি নি। আমি অবশ্য কয়েকবার ঢাকা গিয়েছিলাম, কিন্তু তখন মেজদার কোনো ছবির স্যুটিং ছিলো না। জাফলং-এর কেউ কখনো স্যুটিং দেখেছে বলে মনে হয় না। আনন্দে আমরা তিনজন আত্মহারা হয়ে গেলাম। বিজু তো— 'কী মজা' বলে দিদাকে জড়িয়ে ধরলো।

দিদা হাসতে হাসতে বললেন, 'মন্টু হাঁদার নাটক করা শিকেয় উঠেছে। সেই বিকেল থেকে তোদের বড় জেঠু ওদেরকে খাটিয়ে মারছে। একতলায় দুটো ঘর আর দোতালার একটা ঘর খালি করাতে হচ্ছে। হাঁদা চেয়েছিলো তোদের ঘরে থাকতে। ওর ঘরটাও খালি করতে হচ্ছে কিনা। আমি ভালোমতো বকে দিয়েছি।' বলে দিদা চোখ মটকালেন।

এবার দিদাকে আমি আর রামু মিলে জড়িয়ে ধরলাম— 'তোমার মতো ভালো দিদা পৃথিবীতে আর দুটো নেই।'

'থাক অত সোহাগ দেখাতে হবে না। তোমাদের খাবার জালের আলমারিতে তোলা আছে। ওগুলো নিয়ে ওপরে চলে যাও।' একগাল হেসে দিদা বললেন, 'বিজুর মাকে নারকোলের বরফি বানানোর জন্যে বসিয়ে দিয়েছি। আজ তো আর ওর মাথা ধরে নি যে তোমরা ওপরে গিয়ে খাবে। যাও কুয়োতলায় গিয়ে মুখহাত ধুয়ে নাও গে।'

আমরা তিনজন নাচতে নাচতে কুয়োতলায় গেলাম। বিজু শ্যাওলায় পা পিছলে আছাড় খেয়েও হাসলো! পচার মা থালা বাসন ধুতে এসে বললো, 'মেজদা আসবেন বলে বুঝি খুব আনন্দ হচ্ছে! মা বলেছেন আজ তোমাদের রান্নাঘরে খাওয়া হবে না। ওখানে আমরা নারকোলের চিঁড়ে বরফি বানাবো।'

বিজু বললো, 'তোমরা সারা রাত চিঁড়ে বরফি বানাও না, কে বারণ করেছে!'

আমাদের জন্যে ভাত-তরকারি সবই অন্যদিনের চেয়ে অনেক বেশি ছিলো। দিদা দুপুরে হাঁড়ি কাবাব রান্না করেছিলেন। সেই অপূর্ব খাদ্যটিও আলমারিতে একবাটি আমাদের জন্যে রাখা হয়েছে। এসবই যে দিদার কাণ্ড বুঝতে আমাদের

এতটুকু কষ্ট হলো না।

সবকিছু গুছিয়ে ঘরে রেখে খিড়কির দরজাটা খুলে দেয়া হলো। রামু বললো, 'আজ একটু দেরি করেই খাই, কী বলিস বিজু?'

বিজু রান্নাঘর থেকে আসার সময় পকেটে করে দুখানা নারকেলের বরফি এনেছিলো। তাই রামুর কথায় আপত্তি করলো না। আমার তো আজ রাতে কিছু না খেলেও চলবে।

সবকিছু কেমন যেন পরিপূর্ণ মনে হচ্ছিলো। আমরা তিনজন ছাদের কার্নিশের ধারে বসেছিলাম। চাঁদের আলোয় সারা পৃথিবীটা ভেসে যাচ্ছে। ঝাউবন আর জয়ন্তিয়া পাহাড়ের গা বেয়ে চাঁদের আলো হালকা কুয়াশার সঙ্গে মিশে গিয়ে শব্দহীন স্নিগ্ধ এক ঝর্নার মতো গড়িয়ে পড়ছে। বিজু বলল, 'আবু চেরাপুঞ্জি যেতে চেয়েছিলি না? আমার কিন্তু এখন কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না।'

আমি বললাম, 'চেরাপুঞ্জিই যে আমাদের কাছে এসে গেছে। দুলালদা যখন বললেন, আমি চেরাপুঞ্জি থেকে আসছি, তখন মনে হয়েছিলো আমি নিজেই যেন চেরাপুঞ্জি চলে গেছি।'

রামু বললো, 'আমরা হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা খুঁজছিলাম। এখন আমার মনে হচ্ছে আমি নিজের ভেতর হারিয়ে যাই।'

রামুর মুখে এ ধরনের কথা শুনে আমি একটুও চমকে উঠি নি। কাল দুলালদা, আজ সোনিয়া আমাদের বয়স অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন থেকে আমরা অভিজ্ঞতার সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে যাবো আমাদের অনেকদিনের অচেনা জগতে। দুলালদা আর সোনিয়া যেন অন্তহীন সেই সিঁড়ি, যে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলে আকাশে ছোঁয়া যায়।

সাধু নিকোলাসের গির্জার ঘড়িতে নটার ঘন্টা বাজলো। আমাদের বাড়ির আলো তখন প্রায় সবই নিভে গেছে। শুধু রান্নাঘরে আলো জ্বেলে সেজ কাকিমা মেজদার জন্যে নারকেলের মিষ্টি তৈরি করছিলেন। মেজদা এসব খাবার ভারি পছন্দ করেন। আমাদের নেড়ি কুত্তো টেমিটা কয়েকবার ঘেউঘেউ করে ডাকলো। তার একটু পরেই এলেন দুলালদা।

বিজু বলল, 'টেমি কি আপনাকে দেখে ডাকলো নাকি দুলালদা?'

দুলালদা হেসে বললেন, 'ওটা কি তোমাদের কুকুর? আমি আস্তে একটা ধমক দিতেই পালিয়ে গেলো।'

বিজু বললো, 'টেমি এমনই। কাউকে ভয় পেতে দেখলেই শুধু ওর সাহস বাড়ে।'

দুলালদা বললেন, 'নিচের দরজাটা আমি বন্ধ করে দিয়ে এসেছি।'

আমি বললাম, 'ভালো করেছেন। আজ দরজা খোলা দিয়ে বাড়িতে রীতিমতো নাটক হয়ে গেছে।'

দুলালদা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'ট্র্যাজেডি না কমেডি?'

আমরা তিনজন একসঙ্গে হেসে বললাম, 'কমেডি।'

'যাক বাঁচালে!' দুলালদা হাঁফ ছেড়ে বললেন, 'তাহলে পরেই শুনবো। তোমাদের খাওয়া-দাওয়ার পর্ব কি মিটে গেছে?'

রামু বললো, 'বারে, আমরা তো আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

দুলালদা ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'বলো কী! তোমরা খেয়ে আমার জন্যে কিছু রেখে দিলেই তো পারতে! এসব ছেলেমানুষির কোনো মানে হয়?'

আমি হেসে বললাম, 'আহ্ দুলালদা। আপনি আমাদের গেষ্ট। আপনাকে বাদ দিয়ে কি খাওয়া যায়!'

দুলালদা হেসে ফেললেন— 'গেস্ট নয় বরং ঘোস্ট বলতে পারো। ভূতের মতো এসে তোমাদের কাঁধে চেপেছি।'

বিজু মুখ টিপে হেসে বললো, 'সত্যি বলছি দুলালদা। আপনি যদি সত্যিকারের ভূত হতেন তাহলে আমি ভারি খুশি হতাম। ভূত দেখার ভারি সখ আমার।'

দুলালদা বললেন, 'তাহলে তোমার উচিত ছিলো আজ আমার সঙ্গে যাওয়া। আমি খাসিয়াদের ভূত-পূজো দেখে এসেছি। ভূতকে খুশি করার জন্য যে ছাগলটি বলি দেয়া হয়েছিলো, তার মাংসও খানিকটা চেখে দেখেছি।'

বিজু চোখ কপালে তুলে বললো, 'বলেন কী দুলালদা! দারুভুই যে আমাদের কখনো বলে নি ওরা ভূত-পূজো করে?'

দুলালদা বললেন, 'শুধু ভূত নয়, ওরা দেবতার পূজোও করে। ওদের ঈশ্বরকে ওরা বলে উ ব্লাউ নাংথাউ। একজন দেবতার নাম উ ব্লাই উমতুং, আর একজনের নাম উ ব্লাই সংসপহ। এরকম অনেক দেবতা আছে ওদের। চলো, আগে খেয়ে নিই। পরে তোমাদের খাসিয়াদের গল্প বলবো। যাই বলো ওদের মতো ভালো, নিরীহ মানুষ আর হয় না। ভালো হওয়ার জন্য ওদের দুঃখও অনেক।'

রামু বলল, 'আপনি মুখহাত ধুয়ে নিন। কাল ইচ্ছে করলে আপনি শাওয়ারে গোসল করতে পারবেন।'

দুলালদা হেসে বললেন, 'একদিনে অনেক কিছু ঘটে গেছে দেখছি।'

আমি বললাম, 'আরো দেখবেন। সারাদিন যে কত নাটক হয়েছে!'

দুলালদা আগের মতো হেসে আবার বললেন, 'ট্রাজেডি না কমেডি?'

আমরা তিনজন এক সঙ্গে জবাব দিলাম, 'কমেডি।'

খেয়ে উঠে একটা সিগারেট ধরিয়ে দুলালদা সবেমাত্র খাসিয়াদের ভূতপূজোর গল্প শুরু করেছেন তখনই দরজার বাইরে কয়েকটা টোকা পড়লো। আমরা সবাই ভীষণরকম চমকে উঠলাম। দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দিয়েছিলাম। দুলালদা সিগারেটটা সঙ্গে সঙ্গে নিভিয়ে ফেললেন। বিজু বললো, 'দুলালদা এক্ষুণি আপনি

খাটের তলায় লুকিয়ে পড়ুন।'

দরজায় আবার টোকা পড়লো। সেই সঙ্গে দিদার গলা শুনলাম, 'আমাকে কতক্ষণ বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবি?'

দুলালদা বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। দিদার গলা শুনে আমি মৃদু হেসে বললাম, 'ভয় নেই দুলালদা। দিদাকে আপনার কথা বলেছি।'

রামু দরজা খুলে দিতেই দিদা ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। দিদার হাতে তাঁর মস্ত বড় পানের বাটা। দুলালদাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে, একগাল হেসে বললেন, 'তুমিই তো দুলাল! ছোঁড়রা তোমার যে-রকম বর্ণনা দিয়েছে তাতে হাজার লোকের ভিড়ের ভেতরও তোমাকে খুঁজে বের করে ফেলতাম।'

দুলালদা মৃদু হেসে বললেন, 'আপনি বসুন!'

দিদা আমাদের খাটের উপর বসে আস্ত একটা পান মুখে দিয়ে বললেন, 'বসবো বলেই তো এসেছি। তুমিও বোসো। তোমাকে সকালেই দেখেছিলাম আমি। আমার এই নাতিগুলো এমনই ভালো যে হাঁড়ি-কাবাবের লোভ দেখাতেই তোমার কথা সব বলে ফেললো। তুমি দেখছি ওদের সবই বলে দিয়েছো।'

আমি বললাম, 'কাবাবের লোভ না দেখালেও দুলালদার কথা তোমাকে বলতাম দিদা। তোমার কাছে কোনো কথা আমরা লুকোই না।'

দিদা চোখ পিটপিট করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তাহলে একটু আগে দুলালকে খাটের তলায় লুকোতে বলেছিলো কে?'

বিজু লজ্জায় লাল হয়ে বললো, 'আমি তো ভাবলাম ছোড়দা বুঝি এলো, তুমি না বললে ছোড়দা আমাদের সঙ্গে থাকতে চেয়েছে?'

দিদা বললেন, 'চেয়েছিলো। তারপর ওকে এমন বকে দিয়েছি যে, কক্ষনো তোদের ঘরে শুতে চাইবে না! যাকগে ওসব, যে-জন্যে এসেছি সেটা আগে শেষ করি। তুমি বাছা সঙের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি? খাটের ওপর পা তুলে আরাম করে বোসো। শরীরের ওপর দিয়ে তো কম ধকল যায় নি।'

দুলালদা লাজুক হেসে খাটে উঠে বসলেন। দিদা পান চিবুতে চিবুতে বললেন, 'কিছু মনে কোরো না বাপু। তোমার কথা শোনা অব্দি সারাক্ষণ তোমাকে নিয়ে ভেবেছি। আমার কুটুও এসব করে জেলে গিয়ে পচছে। তোমরা মানুষের অবস্থা ভালো করতে চাও, দেশের মঙ্গল চাও, কুটু আমাকে সবই বলেছে। এখন তোমার কথা বলো। তুমি কী করবে ঠিক করেছো? তোমাকে পুলিস তাড়া করছে, আর তুমিও এখানে-সেখানে পালিয়ে বেড়াচ্ছো-এটা বাপু ভালো কথা নয়। আজকাল শুনি তোমাদের মতো ছেলেদের ধরলে আর জেল পর্যন্ত নেয়ার দরকার মনে করে না ওরা। পথেই নিকেশ করে দেয়। কে মেরেছে কে জানে! ওরা বলে, একদল আরেক দলকে মারছে। এটা বাছা মোটেই ভালো

লক্ষণ নয়। আমি বলি কী, তুমি আমাদের বাসায় থেকে যাও। আবুদের মাস্টার হয়েই না হয় থাকলে। এই এলাকায় যখন কাজ করতে চাও, এখানে থাকলে ক্ষতি কী! আমার বাড়িতে থাকলে বিশ্বাস দারোগা তোমার কেশাগ্রটিও স্পর্শ করতে পারবে না।'

দিদার কথা শেষ হওয়ার পর দুলালদা কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলেন না। দিদা যে দুলালদাকে এভাবে থাকতে বলবেন এটা আমাদের কল্পনার বাইরে ছিল। দিদার জন্যে গর্বে বুকটা ভরে গেল।

দুলালদা একটু পরে আস্তে আস্তে বললেন, 'দিদা আপনার স্নেহের কথা আমি চিরকাল মনে রাখব। মা মারা যাবার পর কেউ আমার ভালোর জন্যে আপনার মতো বলে নি। কাজ আমি এখানেই করবো। আরো কয়েকদিন হয়তো আপনাদের বাসায় থাকতে পারি। তবে আপনি যেভাবে থাকতে বলছেন দিদা, সেভাবে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়! আমি গ্রামেই থাকবো। গ্রামের মানুষদের সঙ্গে আমি মিশে যেতে চাই। আজ সারাদিন ওদের সঙ্গে ছিলাম! ওদের দুঃখ-দুর্দশা যে কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে চোখে না দেখলে কল্পনাও করা যাবে না। আপনাদের বাসায় থেকে কাজ করাটা হয়তে অনেক নিরাপদের হবে। কিন্তু এখানে থেকে ওদের সঙ্গে আমি একাত্ম হতে পারবো না।' একটু থেমে দুলালদা আবার বললেন, 'বিপদের সবরকম ঝুঁকি নিয়েই তো এত বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছি। এতদিন পরে কি বিপদের ভয়ে দায়িত্বে অবহেলা করব দিদা?'

দিদা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন— 'তুই একেবারে কুটুর মতো কথা বলছিস দুলাল। আমি জানি তোদের বিপদের কথা বলে বেঁধে রাখা যাবে না। কুটু যাবার সময় বলে গিয়েছিলো, একজন কুটু মরলে তার বদলে হাজারটা কুটু জন্মাবে। ওরা কতজনকে মারবে? মরণকে হুকুমের চাকর শুধু তোরাই বানাতে পারিস। আমরা অকেজোরা কেবল মরণের ভয়ে আগে থাকতেই আধমরা হয়ে থাকি।'

দুলালদা এবার আর কোনো কথা বললেন না। দিদার কান্না দেখে আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন করতে লাগলো। দিদা চোখ মুছে বললেন, 'যখন যেখানে থাকিস এই বাড়িটাকে তোর নিজের বাড়ি মনে করবি। যখন যা দরকার হবে এই বুড়িকে বলবি। আমি বেঁচে না থাকলেও ওরা থাকবে। তুই যে বললি তোর কথা কেউ ভাবে না—কথাটা সত্যি নয়রে দুলাল! তুই যাদের জন্যে কাজ করিস তারা সবাই তোর কথা ভাববে। তোর কিছু হলে ওদের কী হবে সেটাও একবার ভাবিস। আমরা যারা তোদের মতো কিছু করতে পারি না অথচ দেশের গরিব মানুষের কথা ভাবি, আমরা তোদের কথা ভুলে থাকবো তা কি হয়। কুটু আর ওর বন্ধুদের কথা ভেবে রাতে আমার ঘুম হয় না। আমি জানি এখন তোদের সময় খুব ভালো যাচ্ছে না। ঝোঁকের মাথায় কোনো কাজ করতে যাসনে। এটা

তো তোকে মনে রাখতে হবে, আজকের এই অবস্থায় আসতে তোর ছ'বছর সময় লেগেছে। একবার তোরা কী এক সর্বনেশে খুনের নেশায় মেতে গিয়ে হাজার হাজার ছেলেকে হারালি। শুধু ভুল স্বীকার করাটাই বড় কথা নয়। সামনে যাতে ভুল না হয় সেজন্যে ভেবেচিন্তে কাজ করা উচিত।'

দুলালদা মৃদু হেসে বললেন, 'আপনি এত কথা জানলেন কী করে দিদা?'

দিদা বললেন, 'আমার বয়সটা কি তোর চোখে পড়ছে না? এই বয়সে কম জিনিস তো আর দেখি নি! নিজের হাতে একসময় বোমার মশলাও বানিয়েছি। যাকগে ওসব কথা। তোকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়। কাল সকালে উঠেই তো আবার চোরের মতো পালাবি।' দিদা পানের বাটার ভেতর থেকে একটা কাগজের ঠোঙা বের করলেন। আমাকে বললেন, 'এর ভেতর নারকোলের বরফি আছে। দুলালকে সকালে খেতে দিস!'

আমরা তিনজন দিদার কাণ্ড দেখে শুধু অবাকই হচ্ছিলাম। দিদা খাট থেকে নেমে দুলালদার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, 'আজ রাতে আর ওকে গল্প শোনাবার জন্যে জ্বালাস নে।'

একটি অপরূপ সকাল

পরদিন মোরগের ডাকে ঘুম ভাঙল। ঘরের ভেতর তখনো অন্ধকার। উঠে জানালা খুলে দিলাম। আকাশের কালো রঙটা সবেমাত্র ফিকে হয়ে এসেছে। কুয়াশায় একহাত দূরের জিনিসও ভালো দেখা যাচ্ছে না।

দুলালদাকে রাতে আমরা স্প্রিং বের-করা নোংরা ডিভানে শুতে দিই নি। দুলালদা এখনো ঘুমোচ্ছেন। বিজুর লেপ গায়ে দিয়েছেন তিনি। গত বছর এরকম শীতের সময় নাকি তিনি জব্বলপুরের মার্বেল পাহাড়ে ছিলেন। ওখানকার শীতের কথা শুধু বইয়েই পড়েছিলাম। দুলালদার কাছে সেই শীতের গল্প শুনে আমরা হিম হয়ে গিয়েছি। কী অদ্ভুত জীবন দুলালদার! প্রতিটি মুহূর্তেই নতুন কিছু ঘটছে, বৈচিত্র্যে সবটুকু সময় ভরপুর হয়ে আছে। দুলালদা ঘুমের ভেতর

হাসছেন! স্বপ্ন দেখছেন হয়তো। দুলালদার মতো পবিত্র চেহারার মানুষ আমি শুধু বইয়ে আঁকা ছবিতেই দেখেছি। কী রকম নিষ্পাপ হাসেন দুলালদা!

সোনিয়া একদিন আমাকে বলেছিলো, মন পবিত্র না হলে কেউ নিষ্পাপ হাসতে পারে না। সোনিয়ার হাসি যে নিষ্পাপ একথা আমি ওকে বলি নি। আমার কিছু আবিষ্কার, আমি চাই একান্তভাবে আমারই থাকুক। যেমন সোনিয়াকে আমার ভালো লাগে একথা কাউকেই বলা যাবে না। এমনকি সোনিয়াকেও নয়।

কুয়াশা না থাকলে জয়ন্তিয়া পাহাড়ের সূর্যোদয় ভারী সুন্দর লাগে। এখানো সূর্য ওঠে নি। উলের চাদরটা গায়ে দিয়ে বাইরে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘন কুয়াশার ভেতর ডুবে গেলাম। মনে হলো পৃথিবীতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। ছাদের ওপর একা একা হাঁটতে ভালো লাগছিলো। দিদা বলেন, সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে উঠে বাইরে ঘুরলে মন পবিত্র হয়। কথাটা তিনি মিথ্যে বলেন নি। সোনিয়ার কথা ভাবতে ভাবতে সেদিন ভোরে, কুয়াশার সমুদ্রে ভেসে আমি স্বর্গে চলে গিয়েছিলাম। এমনতিতে স্বর্গ-নরক না থাকুক, আমাদের সবার মনের ভেতর স্বর্গের অস্তিত্ব ঠিকই আছে।

দুলালদা কখন এসে যে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন টের পাইনি। মৃদু হেসে তিনি আস্তে আস্তে বললেন, 'তুমি ঘুম থেকে উঠে আমাকে তুলে দাও নি কেন আবু? তোমার সঙ্গে তাহলে অনেকক্ষণ কুয়াশায় ডুবে থাকা যেতো।'

আমি বললাম, 'আপনি স্বপ্ন দেখছিলেন দুলালদা। তাই ঘুম ভাঙাই নি। শেষ রাতের স্বপ্নগুলো সুন্দর হয়।'

'তুমি কী করে জানলে আমি স্বপ্ন দেখছিলাম?'

'ঘুমের ভেতর আপনি হাসছিলেন যে! আপনার ঠোঁটও নড়ছিলো।'

দুলালদা বললেন, 'বহুদিন পরে মা আর দীপাকে স্বপ্নে দেখলাম। স্বপ্নের ভেতর মনে হচ্ছিলো মা বারবার দীপা হয়ে যাচ্ছেন। আর দীপাকে মনে হচ্ছিলো মার মতো।'

দুলালদা মৃদু হাসছিলেন। ভোরের নরম আকাশের মতো প্রশান্ত আর পবিত্র মনে হলো তাঁকে।

আমি দুলালদাকে হাসি খালা আর সোনিয়ার কথা বললাম। 'আপনার জন্যে কাঁদবার অনেক মানুষ আছে।' এই বলে কথা শেষ করলাম।

দুলালদা কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন 'হাসি খালা আর সোনিয়া সত্যিই খুব ভালো। হাসি খালাকে বোলো ওঁর কথা আমার মনে থাকবে। কয়েকদিন পরে আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করবো।'

আমি মাথা নেড়ে সায় জানালাম। দুলালদা বললেন, 'আমি এখন যাবো। তুমি কি আমাকে একটু এগিয়ে দেবে?'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই দেবো। নইলে এত ভোরে আমি কখনো উঠতাম না।'

দুলালদা বললেন, 'খুব কষ্ট হয়েছে তাই না! শীতের ভোরে সহজে লেপের তলা থেকে বেরুতে ইচ্ছে করে না।'

আমি হেসে বললাম, 'একবার বেরিয়ে পড়লে আর লেপের তলায় ফিরে যেতেও ইচ্ছে হয় না।'

দুলালদা মৃদু হেসে বললেন, 'আমাদের মতো বুঝি? একবার বেরিয়ে পড়তে পারলেই হয়ে গেলো!'

আমি বললাম, 'ঠিক আপনাদের মতো নয়। আপনি কি ইচ্ছে করলেই বাড়ি ফিরে যেতে পারবেন?'

'আমার কখনো সে রকম ইচ্ছে হয় না আবু।'

'আপনার কথা আলাদা। কিন্তু অনেকের তো ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। তখন তো ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যায়।'

'ওদের প্রথমেই ভাবা উচিত। অনেকের জন্য আবার এভাবে বেরিয়ে আসাটা ঠিকও নয়। আমি একটা ঘর ছেড়ে হাজারটা ঘর পেয়েছি। এটাই আমার আনন্দ। আমি কেন নিউ আলীপুরের নিষ্প্রাণ দমবন্ধ করা সেই বাড়িতে, আমার শত্রুদের দুর্গে ফিরে যাবো?'

'সবাই কি আপনার মতো হতে পারে?' কথাটা আমি এত আস্তে বলেছিলাম যে দুলালদা বোধহয় শুনতে পান নি।

ঘরে ঢুকে দেখি রামু আর বিজু অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমি দিদার দেয়া নারকেলের বরফি আর চিঁড়েগুলো দুলালদাকে দিলাম। ওগুলো রুমালে বেঁধে নিয়ে দুলালদা বললেন, 'আমি এখন যাদের বাড়িতে যাবো, ওদের বাচ্চারা এগুলো পেলে ভারি খুশি হবে। মানাতিনরা খুবই গরিব; কাল পুজো ছিল বলে ওরা চাট্টি খেতে পেয়েছিলো। নইলে অনকেদিন শুধু পাহাড়ি ঘাসের বীজ পুড়িয়ে আর সেদ্ধ করে খায়।'

আমি কয়েক মুহূর্ত দুলালদার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এক মিনিট দাঁড়ান দুলালদা। আমি আসছি।'

এক ছুটে আমি নিচে চলে গেলাম। রান্নাঘরে যাওয়ার সময় দিদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। দিদা তসবি জপছিলেন। আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন।

আমি বললাম, 'আরো কিছু বরফি নেবো দিদা।'

দিদা ঘাড় নেড়ে সায় জানিয়ে ওঁর ঘরের দিকে চলে গেলেন। একটা কাগজের ঠোঙায় করে কয়েক মুঠো চিঁড়ে আর বরফি নিলাম। সেজ কাকিমা মেজদার জন্যে এত বেশি তৈরি করেছেন যে, আরো কিছু নিলেও টের পেতেন না। বরফিগুলো এনে দুলালদাকে দিতেই তিনি হেসে বললেন, 'সেজ কাকিমা জানলে রাগ করবেন না?'

আমি বললাম, 'দিদা জেনেছেন। সবকিছু সামলানোর ভার এখন দিদার ওপর।'

'ওঁকে বুঝি বলেছো, আমার জন্যে বরফি নিচ্ছো? আমাকে কী পেটুকই না ভাববেন তিনি!'

'না আপনার কথা বলি নি। দিদা নামাজ পড়ে উঠে তসবি গুনছেন। এসময় তিনি কারো সঙ্গে কথা বলেন না। আমি শুধু বলেছি বরফি নিচ্ছি।'

রামু-বিজুর ঘুম সহজে ভাঙবে বলে মনে হয় না। আমি বললাম, 'চলুন দুলালদা, ওদের আর তুলবো না। যদিও ফিরে এলে ওদের বকুনি শুনতে হবে, তবে আপাতত মনে হচ্ছে ঘুমোনোটাই ওরা বেশি পছন্দ করছে।'

দুলালদা মৃদু হেসে বললেন, 'বেশ তো চলো। ফেরার পথে তুমি যে একা হয়ে যাবে!'

দুলালদাকে আর বলা হলো না যে, আমি ইচ্ছে করেই একা যেতে চাই। পথে সোনিয়ার সঙ্গে যদি দেখা হয়! সেই সময়টুকু শুধু আমারই জন্যে থাকুক।

আগের মতো আমরা দুজন লোহার সিঁড়ি বেয়ে নেমে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। দুলালদাকে পচার মার আবর্জনা ফেলা আর ডাকাত দেখার কথা বললাম। দিদা কীভাবে ওকে বকুনি দিয়েছেন সে কথা শুনে দুলালদা হাসতে হাসতে বললেন, 'দিদার কোনো তুলনা হয় না।'

আকাশে ভোরের আলো আরেকটু স্বচ্ছ হলেও কুয়াশার ঘোর তখনো এতটুকু কাটে নি। নুড়ি-বিছানো পথে আমরা দুজন চুপচাপ হাঁটছিলাম। দুলালদা আমার কাঁধে হাত রেখেছেন। মনে হল আমি অনেক বড় হয়ে গেছি।

সোনিয়াদের বাড়ির কাচের জানালাগুলো সব বন্ধ। একটা ঘরে টেবিল ল্যাম্পের মৃদু আলো জ্বলছে। ওটা হাসি খালার ঘর। দুলালদা বললেন, 'এটা সোনিয়াদের বাড়ি না?'

আমি বললাম, 'আপনার মনে আছে তাহলে! কাল ভোরে ফেরার পথে সোনিয়া আর হাসি খালাকে জানালার কাছে বসে থাকতে দেখেছিলাম। সোনিয়া আমাদের দেখেই হাত নেড়েছিলো।'

দুলালদা বললেন, 'হাসি খালা কি লেখাপড়া জানেন?'

আমি বললাম, 'ঢাকায় থাকতে তিনি ওখানকার এক কলেজে পড়াতেন। অনেক বই আছে ওঁর। আমাদের দিদাও বেথুনে পড়েছিলেন। অবশ্য বি এ পাশ করার আগেই দাদুর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গিয়েছিলো।'

দুলালদা হেসে বললেন, 'আমাদের দেশের মেয়েরা কি পরীক্ষায় পাশ করার জন্যে বি এ, এম এ, পড়ে? দিদাদের সময়ে অবশ্য রান্না আর সেলাই জানলেই চলতো। গান জানলে ভালো হতো।'

আমি হেসে বললাম, 'সেই সঙ্গে গায়ের রঙটা ঘসে দেখা হতো, দাঁতগুলো ঠুকে দেখা হতো, চুলগুলো মেপে দেখা হতো।'

দুলালদা শব্দ করে হাসলেন— 'তুমি এত কথা জানলে কোত্থেকে?'

'দিদা বলেছেন। বেথুনে পড়া দিদাকেও এসব পরীক্ষায় পাশ করতে হয়েছিলো।'

দুলালদা একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন— 'আমাদের দেশের মেয়েরা এত অসহায় যে বলার নয়। ভেবে দেখো, দিদার মতো মেয়েকেও এসব মেনে নিতে হয়েছিলো। মেয়েদের শক্তি যে ছেলেদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়, এটা উপলব্ধি করতে আরো অনেক সময় লাগবে। কী অদ্ভুত নিয়ম! সোনিয়ার বাবা আরেকটা বিয়ে করলেও সোনিয়ার মাকে সব কিছু মেনে নিতে হবে!'

আমি বললাম, 'তার চেয়েও বিচ্ছিরি ব্যাপার হচ্ছে সোনিয়ার বাবার জন্যে হাসি খালাকেই দায়ী করা হয়। অথচ হাসি খালার মতো পবিত্র মানুষ আমি খুব কম দেখেছি।'

দুলালদা কিছুক্ষণ চুপ থেকে আপন মনে বললেন, 'আমার মাকেও কম দুঃখ সইতে হয় নি।'

আমি ভাবছিলাম দুলালদার কথা। তাঁর দুঃখ কি কম! যে পার্টির জন্য তিনি সব কিছু ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, এতদিন পরে দেখেলেন সেই পার্টি ভুল কাজ করেছে। কতদিনের বন্ধুরা চোখের সামনে মরে গেছে। দুলালদা দীপার কথা বলতে গিয়ে একবার বলেছিলেন, কাজের ভেতর দিয়ে যে বন্ধুত্ব হয় সেটাই হচ্ছে আসল। আমি আর সোনিয়া যদি কখনো বিপ্লবী হয়ে যাই, যখন আমার সঙ্গে সোনিয়া ছাড়া আর কেউ থাকবে না, তখন যদি সোনিয়া মরে যায় তাহলে আমিও যে ওর সঙ্গে মরে যাবো! দুলালদা আরো অনেক কিছু সহ্য করেছেন। নেতাদের স্বার্থপরতা, পার্টি টুকরো-টুকরো হয়ে যাওয়া, নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে অবিরাম ছুটে চলা—এতকিছুর পরও দুলালদা হাসছেন, কাজ করেছেন, বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছেন। একেই তো বলে সত্যিকার অর্থে বেঁচে থাকা। দিদা ঠিকই বলেন, আমরা অকেজোরা মরার ভয়ে মারা যাবার আগেই মরে থাকি।

কমলালেবুর বাগানের শেষ প্রান্তে এসে দুলালদা বললেন, 'ঠিক আছে আবু, এবার আমি যেতে পারবো।'

আমি বললাম, 'দুলালদা আপনাকে আমি ঝর্না পর্যন্ত এগিয়ে দেবো।'

দুলালদা মৃদু হেসে বললেন, 'কাল বলবে, ঝর্নার ওপারে পৌছে দেবো। আর পরশু বলবে জয়ন্তিয়া পাহাড়ে পৌছে দেবো।'

আমি হেসে বললাম, 'ঠিক ধরেছেন দুলালদা। একদিন এভাবেই আপনার সঙ্গে বেরিয়ে পড়বো।'

দুলালদা আমার কথার কোনো প্রতিবাদ না করে চুপচাপ হাঁটতে লাগলেন। নুড়ি-বিছানো পাহাড়ের ঢালু পথে নামতে দুলালদার এখনো বেশ অসুবিধে হয়। অথচ আমরা তরতর করে নেমে যাই। দুলালদাকে বললাম, 'আমার হাত ধরুন দুলালদা। নইলে পিছলে যাবেন।'

দুলালদা আমার হাত ধরে হেসে বললেন, 'কাল সন্ধ্যেয় পাহাড় থেকে নামার সময় পিছলে গিয়েছিলাম। তখন মনে হয়েছে পিছলে পড়াটা খুব একটা খারাপ কিছু নয়। মজাই লাগে।'

আমি বললাম, 'আমরা এটাকে বলি গড়িয়ে যাওয়া খেলা। এখনো মাঝে মাঝে খেলি। ছুটে এসে পাহাড়ের ঢালুতে পা ছেড়ে দেই। বেশ মজার খেলা।'

দুলালদা বললেন, 'মজা, তবে বেশি খেললে প্যান্ট ছিঁড়ে যাবার ভয় আছে।'

আমি আর দুলালদা একসঙ্গে হেসে উঠলাম। কুয়াশার পর্দা স্বচ্ছ হয়ে চোখের সামনে ঝর্নাটা যেন লাফিয়ে উঠলো। কলকল শব্দ তুলে আয়নার মতো স্বচ্ছ ঝর্নাধারাটি অবিরাম বয়ে চলেছে। বড় বড় সব পাথর ঝর্নার পানিতে মাথা উঁচু করে পড়ে আছে। নিচে রঙিন নুড়ি ছড়ানো। ঝর্নার ওপর কে যেন কুয়াশার একটুকরো ফিনফিনে চাদর বিছিয়ে রেখেছে।

দুলালদা প্যান্ট গুটিয়ে স্যান্ডেল হাতে নিয়ে বললেন, 'এবার কেটে পড়া আবু। পানিতে তোমার পা জমে যাবে। পানিটা এমন ঠাণ্ডা যে মনে হয় ধারালো ছুরির ওপর দিয়ে হাঁটছি।'

আমি বললাম, 'কদিন পরে ছুরির ওপর দিয়ে হাঁটা ঠিকই অভ্যেস করে ফেলবো দুলালদা।'

দুলালদা আমার কাঁধ চাপড়ে ঝর্নার পানিতে নেমে গেলেন। ঠাণ্ডার কথা ভেবে আমি নিজেই শীতে কাঁপতে লাগলাম। কুয়াশার ভেতর দুলালদা পুরোপুরি হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দূরে একটা বনমোরগ কাঁপাকাঁপা গলায় ডেকে উঠলো। মনে হলো, খাসিয়াদের গ্রামগুলো দুলালদাকে ডাকছে।

ওপরে তাকিয়ে দেখি আকাশ থেকে সাদা কুয়াশার পর্দা ঝুলছে। তার ভেতর ফ্যাকাশে সূর্যটা ভাসছে। আমাদের কমলা বাগানের চিহ্নটি কোথাও নেই। নিজেকে হঠাৎ ভীষণ একা মনে হলো। দুলালদা চলে গেলেন খাসিয়াদের গ্রামে। রামু-বিজু ঘরে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। আমার চারপাশে কোনো লোকজন নেই। ঝর্নার একটানা মৃদু শব্দ ছাড়া কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। উত্তরের পাহাড় থেকে হু হু করে একঝলক হিমেল বাতাস চোখেমুখে আঁচড় কেটে বয়ে গেলো। আর তখনই মনে পড়লো সোনিয়ার কথা। শীত তাড়াবার জন্যে আমি সটান দৌড় দিলাম।

সোনিয়াদের বাসার কাছে এসে দেখি ও কাঠের ছোট্ট গেটটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে মিষ্টি হেসে বললো, 'দুলালদাকে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলি বুঝি?'

আমি হেসে বললাম, 'তুই জানলি কী করে?'

সোনিয়া বললো, 'আমি জানালার পাশে ছিলাম যে! দুলালদা জানালার দিকে তাকিয়েছিলেন। অবশ্য তিনি আমাকে দেখতে পান নি। আলোয় থাকলে

অন্ধকারের কিছু দেখা যায় না।'

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'কী চমৎকার কথা বললি সোনিয়া! অথচ অন্ধকারে থাকলে আমরা ঠিক আলো দেখতে পাই।'

সোনিয়ার মুখে গোলাপের ছায়া পড়লো। কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। চারপাশে কুয়াশার সাদা দেয়াল তখন রোদের আলোয় দ্রুত গলে যাচ্ছে। একটা দুটো নাম-না-জানা পাখি ডাকতে শুরু করেছে। সোনিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো ও যদি দীপার মতো হতো তাহলে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে কাউকে পরোয়া করতাম না। আস্তে আস্তে সোনিয়াকে বললাম, 'একদিন তোকে দীপার গল্প বলবো। দুলালদার সবচেয়ে কাছের বন্ধু ছিলো দীপা।'

সোনিয়া বড় বড় চোখে আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললো, 'দাঁড়া, আমি এক্ষুনি আসছি।'

সোনিয়া ছুটে গিয়ে লনের উপর জমে-থাকা কুয়াশায় হারিয়ে গেলো। একটু পরে আবার কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। ওর হাতে মস্ত বড় একটা লাল গোলাপ। কোনো কথা না বলে সোনিয়া গোলাপটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো। গোলাপের মখমলের মতো নরম পাপড়িতে মুক্তোর দানার মতো শিশির লেগেছিলো। ওর হাত থেকে গোলাপটা নিয়ে বুক ভরে গন্ধ নিলাম। কাল সন্ধ্যায় এরকম এক মিষ্টি গন্ধে আমার বুকটা ভরেছিলো।

সোনিয়ার মোমের মতো গালে তখনো গোলাপের ছায়া জড়িয়ে আছে। ঠোঁট দুটো গোলাপের সদ্য ফোটা কলির মতো। আমি মৃদু হেসে বললাম, 'এটা কিসের জন্যে সোনিয়া?'

সোনিয়া বলল, 'তুই যে এরকম দারুণ বিচ্ছিরি এক শীতের ভোরে দুলালদাকে পৌঁছে দিতে গেছিস, সেজন্য এটা তোর পাওনা ছিলো।'

আমি ফিসফিস করে বললাম, 'সোনিয়া, এরকম সুন্দর সকাল আমার জীবনে কখনো আসে নি।'

সোনিয়া মৃদু হেসে বললো, 'বিকেলে তোরা আসবি তো?'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

মেজদা ও তাঁর সঙ্গীরা

ঘরে ফিরতেই রামু আর বিজু মহা হইচই আরম্ভ করে দিলো। 'কী স্বার্থপর তুই। আমাদের ফেলে একা চলে গেলি! তোর সাহস তো কম নয়! পথে কিছু ঘটলে একা সামলাতে পারতি?'

এরকম অনেকগুলো কথা ওদের দুজনের মুখ দিয়ে ফোয়ারার মতো বেরুতে লাগলো। আমার মনটা তখন এত বেশি প্রসন্ন ছিলো যে, ওদের কথার বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করি নি। গোলাপ ফুলটা আমি ছোট্ট একটা ডিম্পলের শিশিতে রেখে দিলাম। ডিম্পলের শিশিটা আমাকে অনেক আগে মেজদা দিয়েছিলেন। ওতে আমি তুঁত-মেশানো রঙিন পানি রাখতাম। মাঝে মাঝে সরকারদের বাসা থেকে ফুল চুরি করেও শিশিটায় রেখে দিতাম। সোনিয়ার দেয়া বড় গোলাপটা শিশিতে করে টেবিলের মাঝখানে রাখার পর মনে হল সারা ঘর আলো হয়ে গেছে। রামু, বিজু ওটা দেখে কিছু বললো না। ওরা হয়তো ভেবেছে আমি চুরি করে এনেছি। ভাবুকগে। আজ সকালে সোনিয়ার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা আমি কাউকে বলবো না।

কুয়াশা কেটে গিয়ে যখন নীল আকাশ, ঘন সবুজ ঝাউবন দূরের ধূসর পাহাড় হলুদ রোদে ঝলমল করে উঠলো তখন মেজদা এলেন তাঁর দলবল নিয়ে। দুটো বড় জিপে মালপত্র বোঝাই করে এনেছেন তিনি। মেজদার গাড়ি দেখার জন্যে আমরা তিনজন ছাদে বসেছিলাম। দুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে, 'মেজদা এসেছে'— বলে একছুটে একেবারে সদর দরজায় চলে গেলাম।

আমাদের দেখে মেজদা হেসে বললেন, 'এই যে থ্রি মাস্কেটিয়ার্স। তোমরা সবাই ভালো আছো তো? চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে খুবই ভালো আছো।'

আমরা তিনজন শুধু হাসলাম। মেজদা জিপ থেকে নামলেন। তাঁর পাশে বসা ছিলো দারুণ সাজগোজ করা এক মহিলা। চেহারাটা চেনা-চেনা মনে হলো। তিনিও মেজদার পেছন-পেছন নামলেন। বিজু আমার কানে কানে বলল, 'মেজদার হবু বউ নাকি রে!'

আমি ততক্ষণে সেই মহিলাকে চিনতে পেরেছি। চাপা গলায় বিজুকে ধমক দিলাম—'কী যা তা বলছিস্! ইনিই তো মেজদার ছবির নায়িকা উর্মিলা। কাগজে ছবি দেখিস নি?'

আমার কথা শুনে বিজুর চোখ কপালে উঠে গেলো। আসলে ছবির নায়িকা উর্মিলাকে এই অবস্থায় দেখবো আমি ভাবতেই পারি নি। ছবিতে উর্মিলা গরিবের মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেন, কথায় কথায় কেঁদে বুক ভাসিয়ে দেন। সারাক্ষণ চেহারায় একটা দুঃখের ভাব ঝুলিয়ে রাখেন। সিনেমায় তাঁকে দেখলে মেয়েরা সব সময় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। মনে হয় উর্মিলার চেয়ে দুঃখী মেয়ে সারা পৃথিবীতে দুটো নেই। অথচ আমরা এখন যে উর্মিলাকে দেখছি তিনি চুমকির নকশায় বোঝাই একখানা বেগুনি রঙের জর্জেটের শাড়ি পরেছেন। গলায় নেকলেসটা নির্ঘাত আসল হিরে দিয়ে বানানো। তাঁর মুখটা ভীষণ চকচক করছিলো। চোখের পাতায় হালকা বেগুনি রঙ, তার উপর রূপোলি গুঁড়ো, গালে আপেলের রঙ, ঠোঁটে মুক্তোর রঙের লিপস্টিক মাখা, নখে বেগুনি রঙের নেলপালিশ, আঙুলে কবুতরের ডিমের মতো বড় বেগুনি রঙের পাথর বসানো আঙটি—সবকিছু মিলিয়ে রীতিমতো চোখ-ধাঁধানো ব্যাপার।

পেছনে ছিলেন বাংলা ছবির নায়কসম্রাট আব্বাস। সিনেমার এই শরৎচন্দ্রীয় নায়কটি পরেছেন সেইন্ট-এর ছাপঅলা টকটকে লাল গেঞ্জি আর ঘন নীল প্যান্ট। নায়িকা উর্মিলা আর নায়ক আব্বাস দুজনকেই দারুণ স্মার্ট দেখাচ্ছিলো। তবে মেজদা যদি আমাদের দুলালদাকে দেখতেন তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁকে আগামী সব কটা ছবির নায়ক বানিয়ে ফেলতেন।

কমেডিয়ান আলতামাসকে দেখে আমাদের হাসি চাপা দায় হলো। গোপাল ভাঁড়ের মতো দেখতে বেঁটেখাটো, মস্ত বড় ভুঁড়ি, মাথা জুড়ে বিশাল টাক; চোখে এমন একটা নিরীহ ভাব যে, এই ভদ্রলোককে ছবিতে দেখে ছেলেবুড়ো সবাই হেসে গড়াগড়ি যায়। তার সঙ্গে আরো দুজন মহিলা রয়েছেন। ওঁরা বোধ হয় নায়িকার বান্ধবী-টান্ধবী হবেন।

ছোটকা ছোড়দা ঝন্টুদা সবাই এসে চেঁচিয়ে চাকর-মালি সবাইকে ডেকে হুলুস্থুল কাণ্ড বাঁধিয়ে তুলেছেন। ছোড়দা এমনই চ্যাঁচাচ্ছিলেন যে মেজদা শেষ পর্যন্ত হেসে বললেন, 'নাটক করে করে গলাটা কী বানিয়েছিস হাঁদু? তোর চিৎকারে আমার কানের ভিতর প্রজাপতি ওড়া শুরু করেছে।'

আমাদের সদর দরজার কাছে তখন রীতিমতো ভিড় জমে গেছে। ছোটকা বললেন, 'পল্টু, এঁদের নিয়ে ভেতরে যা। জিনিসপত্র সব আমরা নামাচ্ছি।'

'তোমাদের কিছু করতে হবে না ছোটকা। প্রোডাকশনের ছেলেরা আছে। ওরাই সব করবে।' এই বলে মেজদা আমাদের দিকে তাকালেন— 'রামু, আবু, বিজু সবাই ওপরে চলো। তোমাদের জন্যে কিছু সুন্দর উপহার এনেছি। পরীক্ষায়

নিশ্চয়ই তোমাদের আগের প্লেসগুলো বহাল রয়েছে?'

আমরা হেসে মাথা নাড়লাম। নায়িকা উর্মিলা, নায়ক আব্বাস, কমেডিয়ান আলতামাস আর সঙ্গে অচেনা একজন ভদ্রলোককে নিয়ে মেজদা ওপরে গেলেন। গলায় ভিউ ফাইন্ডার ঝোলানো দেখে, তাঁকে প্রথম থেকেই ভেবেছিলাম ছবির ক্যামেরাম্যান।

মেজদা আমাদের জন্যে এনেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঁধানো রচনাবলীর বারোটি খন্ড। রামুর জন্যে এনেছেন রিডার্স ডাইজেস্ট-এর মস্তবড় একটা এ্যাটলাস আর তিনখন্ড এনসাইক্লোপিডিয়া। বিজুর জন্যে এনেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সমগ্র রচনাবলী। মেজদা কী করে যে আমাদের মনের কথা টের পান বুঝি না। মা আমার বই দেখে বললেন, 'ওর কি এসব বই পড়া উচিত হবে?'

মেজদা হেসে বললেন, 'ও যে আমার আলমারির বঙ্কিম আর শরৎ রচনাবলী পড়ে শেষ করেছে সে খবর নিশ্চয়ই আপনার কানে যায় নি কাকিমা! মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সব লেখা ও অবশ্য এখন বুঝবে না। তবু ওর পড়া দরকার। এগুলো খারাপ কিছু নয়।'

মাকে বললাম, 'আমি কবে পদ্মা নদীর মাঝি পড়েছি! ওতে না বোঝার কী আছে!'

সব মায়েরাই নিজের ছেলেদের ভাবেন কম বোঝে।

রামু মেজদাকে বলেছিলো এ্যাটলাসের কথা। মেজদা যে এত সুন্দর আর দামী এ্যাটলাস আনবেন ও ভাবতেই পারেনি। ওর চেহারা দেখে মনে হল কেঁদে ফেলবে। শেষ পর্যন্ত রামু তাই করলো। বই নিয়ে চিলেকোঠার ঘরে গিয়ে কেঁদেই ফেললো। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই চোখ মুছে ফেলেছিলো। আমি জানি খুব খুশি হলে বা দুঃখ পেলে রামুর মেজ জেঠুর কথা মনে পড়ে যায়। মেজ জেঠু যখন মারা যান তখন ও আর আমি ক্লাস ফোরে পড়তাম। রামুর কাছে গিয়ে ওর পিঠে হাত রেখে বললাম, 'তুইই কিন্তু জিতেছিস রামু। মেজদা তোকে বেশি ভালোবাসেন।'

রামু হেসে বলল, 'বারে, আমি যে ফার্স্ট হয়েছি। গতবার মেজদা আমাকে কী সুন্দর একটা শার্ট পাঠিয়েছিলেন।'

সেবার মেজদা আমাকে আর বিজুকে কিছু পাঠান নি। তবে রামুর জন্যে ড্রাগনের ছবি-আঁকা যে জামাটা পাঠিয়েছিলেন ওটা আমিও কদিন পরেছি। এমনভাবে পরেছি যাতে বাইরের লোকেরা ভাবে মেজদা আমাদের জন্যে দুটো এক রকম জামা পাঠিয়েছেন।

বিজু হঠাৎ খুশিতে চেঁচিয়ে উঠে বললো, 'দেখ দেখ, এখানে হিমালয়ের ভয়ংকরটা আছে।'

রামু বলল, 'সমগ্র রচনাবলী মানে কী রে বোকা! ওতে হেমেন্দ্রকুমারের সব লেখাই পাবি।'

বিজু গম্ভীর হয়ে বলল, 'দাঁড়া, এখনো মানুষ পিশাচটা খুঁজে পাচ্ছি না।'

আমার এখন আর হেমেন্দ্রকুমার ভালো লাগে না। রামু এসব বই কখনো পড়ে না। ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো লেখা পড়েছে বলে আমার মনে হয় না। তবে এটা ঠিক যে এনসাইক্লোপিডিয়াগুলো শেষ করতে রামুর বেশিদিন লাগবে না। ও সবসময় অন্য ধরনের বই পড়ে। গল্প, উপন্যাস ছাড়া মনে হয় ওর সবই ভালো লাগে।

রামু বললো, হ্যাঁরে আবু, সোনিয়াকে মেজদার স্যুটিং দেখতে বলবি না?'

আমি বললাম, 'মেজদা যদি কাছাকাছি কোথাও স্যুটিং করেন তবে বলবো।'

'আজ বিকেলে কি ওদের বাসায় যাবি?'

নিশ্চয়ই যাবো।'

'যদি মেজদার স্যুটিং থাকে?'

'তাহলে তোরাই স্যুটিং দেখিস। আমি ওদের বাসায় যাবো বলে কথা দিয়েছি।'

রামু এরপর আর কোনো কথা বললো না। রামুর জন্যে আমার মনটা নরম হয়ে গেল। রামু বুঝতে পেরেছে কিনা জানি না, তবে আমার মনে হলো সোনিয়া আজ সকালে আমার মনে এত কাছাকাছি চলে এসেছে যে, এতদিন রামু-বিজু ছাড়া অন্য কেউ সেখানে আসতে পারে নি। একবার মনে হলো রামু সোনিয়াকে হিংসে করছে। সে যাই ভাবুক, সোনিয়া হলো সোনিয়াই। ওর জায়গাতে ও আসবেই। ও যদি আমার জন্যে ভাবে, আমি কেন ওর জন্যে ভাববো না? সোনিয়াকে রামুর হিংসে করা উচিত নয়।

একটু পরে মেজদা নারকেলের চিঁড়ে চিবুতে চিবুতে আমাদের ঘরে এলেন।' বললেন, 'আজ দুপুরের পর কমলালেবুর বাগানে স্যুটিং করবো। তোমরা থেকো।'

মেজদা ছাদে গিয়ে ঘুরে ঘুরে চারপাশটা দেখলেন। বললেন, 'একদিন পিয়াইন নদীতে যাবো স্যুটিং করতে। আমার নায়িকাটি সেই নদীতে ডুবে মরবে।'

বিজুর চোখ দুটো আলুর মতো হয়ে গেলো। রামু বললো, 'অমন করে তাকাচ্ছিস কেন বিজু? চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে যাবে যে! ও কি সত্যি সত্যি মরবে!'

বিজু বলল, 'আমি বুঝি তাই বলেছি! আমি ভাবছি অত উঁচু থেকে নদীতে লাফ দেবে কী করে?'

মেজদা বললেন, 'আসলে কি আর লাফ দেবে! লাফ দেয়ার মুহূর্তে আমি ওকে কাটবো। কেটেই ক্যামেরায় নদীর স্রোত ধরবো। আমার ক্যামেরামান অবশ্য বলেছিলো ডামি দিয়ে পড়ার শটটা নিতে। আমি রাজি হই নি। আমি ওখানে

একটা মন্টাজ এফেক্ট রাখবো। এখন কি আর ছবিতে সব কিছু রিয়ালিষ্টিক দেখায়!'

মেজদার কথা শোনার সময় বিজু হা করে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলো। আমি আর রামু না বুঝেও গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ছিলাম। মেজদার ধারণা ওঁর ভাই বলে মন্টাজ ফন্টাজ সবই যেন আমরা বুঝি।

পাহাড়ি ঝর্নার দিকে তাকিয়ে মেজদা বললেন, 'কী চমৎকার জায়গা! আমাদের দেশের যে এরকম স্যুটিং স্পষ্ট আছে কেউ ভাবতেও পারবে না। পাহাড় আর ঝর্নায় আমার নায়ক ভিলেনের চেযিংটা ভালো জমবে। আমাদের ফাইট ডিরেক্টর অবশ্য দুদিন পরে আসবে। বেচারা এক আনাড়ি এক্সট্রাকে সোর্ড ফাইট শেখাতে গিয়েছিলো। তারপর নিজেই কাঠের তলোয়ারের খোঁচা খেয়ে জখম হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে।'

আমি বললাম, 'আপনার ভিলেনকে তো দেখলাম না মেজদা।'

মেজদা বললেন, 'আমাদের প্রোডাকশনের বাবুর্চিটা ভিলেনের পার্ট করবে। ওর ডায়ালগ বেশি নেই। সবই প্রায় এ্যাকশন। সবাই কাজ দেখে বলছে, ওর কপাল খুলে গেছে। ওকে আর বাবুর্চিগিরি করতে হবে না। নামকরা স্টার হয়ে যাবে। তবে আলাদিন আমাকে বলেছে, ওর ইচ্ছে নাকি ডিরেক্টর হওয়া।'

আমি হেসে বললাম, 'ডিরেক্টর হওয়া বুঝি খুব সোজা ব্যাপার মেজদা?'

মেজদা বললেন, 'আমাদের দেশে এ আর এমন কঠিন কী! আমার বন্ধু স্যালকে মনে আছে তোদের? ও তো দুটো সিরিয়াস ছবি করতে গিয়ে মার খেয়ে পথে বসেছে। আর ওর ইউনিটের টি-বয় ছিল আক্কাস আলী। সে এখন দুটো রূপকথা বানিয়ে দারুণ হিট ডিরেক্টর। শুনছি ওর ছবি নাকি বিদেশেও যাচ্ছে। ছবি বানানো আমাদের দেশে এত সোজা কাজ যে কোনোদিন যদি শুনি আমাদের বনমালী সুপার হিট ডিরেক্টর হয়ে গেছে, তখন আমি এতটুকু অবাক হবো না।'

আমাদের বুড়ো বনমালী—যে এখনো বলে পৃথিবীটা একটা মস্তবড় গরুর শিঙের ওপর রাখা আছে, গরু শিং বদল করার সময় পৃথিবীতে ভূমিকম্প হয়; যার ধারণা আমাদের বাড়িটার চেয়ে বড় বাড়ি পৃথিবীতে আর নেই—ও হবে ফিল্ম ডিরেক্টর! আমরা তিনজন হেসে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে গেলাম। মেজদা দারুণ মজার কথা বলতে পারেন! আমাদের হাসি দেখে মেজদা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'হাসছিস কেন, ঢাকায় গেলে তোদের দেখিয়ে দেবো ওখানে এখন কারা ছবি বানাচ্ছে। জাহাঙ্গীরদের গাড়ির ড্রাইভারটাও যে দুটো ছবি বানিয়েছে সে খবর রাখিস? সেই ছবির নায়কও ছিলো ও নিজে। ছবি দুটো অবশ্য ভালো চলে নি। কালো টাকার দাপটে গোটা দেশটা একেবারে রসাতলে গেছে।'

মেজদা একসময় দু-তিনটা ভালো ছবি বানিয়ে দারুণ নাম করেছিলেন। তবে সে ছবি বানাবার জন্যে আমাদের বাড়িটি বন্ধক রাখতে হয়েছিলো। আজকাল

মেজদাও ধুম-ধাড়াক্কার জবরদস্ত ফাইটিং ছবি বানাচ্ছেন। এখন যেটার স্যুটিং করছেন সেটার নাম রাজকন্যা কঙ্কাবতী। কাহিনীটি অবশ্য রূপকথার। তবে সোর্ড ফাইটের সঙ্গে জুডো, কারাত, গান-ফাইট সবই নাকি আছে। মেজদার গত ছবিটা ছিলো এক ডাকাতের জীবনী নিয়ে। দিদা ওই ছবি দেখে হাসতে হাসতে খুন হয়ে গেছেন। যদিও ছবিটা আগাগোড়া ছিল করুণ রসে ভরপুর। নায়িকা উর্মিলার করুণ অভিনয় দেখে কত মহিলা যে হলে বসে হাউমাউ করে কেঁদেছেন তার ইয়ত্তা নেই। দিদা ছবি দেখে বলেছেন, 'পল্টুর বুদ্ধি-সুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে নাকি! লোক হাসানোর জন্য এসব বানাবার কোনো মানে হয়!' তবে ছোট কাকিমা আড়ালে বলেছেন, 'মার সবটাতেই বাড়াবাড়ি। আমার কাছে তো ছবিটা ভালোই লেগেছে।'

দুপুরে খাওয়ার পর মেজদা দলবল নিয়ে কমলাবাগানে চলে গেলেন। বললেন, 'যতক্ষণ রোদ থাকবে ততক্ষণ স্যুটিং করব। দেখি নায়ক-নায়িকার ডুয়েট গানটা পুরো পিকচারাইজ করা যায় কিনা।'

রামু আর বিজু মেজদার সঙ্গে গেলো। আমি চলে গেলাম সোজা সোনিয়াদের বাড়িতে। সোনিয়াকে গিয়ে বললাম, 'মেজদা স্যুটিং করবেন কমলালেবুর বাগানে। যাবি স্যুটিং দেখতে?'

হাসি খালা বললেন, 'পল্টু কবে এসেছে আবু?'

আমি বললাম, 'আজ সকালে। সোনিয়াকে নিয়ে স্যুটিং দেখতে যাবো হাসি খালা?'

হাসি খালা উল বুনতে বুনতে বললেন, 'যাও। তবে বিকেলে এখানে চা খেতে ভুলে যেও না।'

নুড়ি-বিছানো পথে আমি আর সোনিয়া হাত ধরাধরি করে হাঁটছিলাম। শীতের শেষ দুপুরের নরম রোদের ভেতর মনে হলো, আমরা যেন দুটো রঙিন প্রজাপতি হয়ে স্বর্গের বাগানে উড়ছি।

কমলালেবুর বাগানে মেজদা একটা গানের দৃশ্য ক্যামেরায় তুলছিলেন। গানের কথাগুলো ভারি করুণ। পেছনে টেপরেকর্ডারে গানটা গাইছিলেন দুজন গায়ক-গায়িকা। নায়ক আব্বাস আর নায়িকা উর্মিলা চোখে গ্লিসারিন দিয়ে কাপড় আলুথালু করে অত্যন্ত হাস্যকর কথাঅলা সেই গানের সঙ্গে ঠোঁট মেলাচ্ছিলেন। এমন দুঃখের দিনেও নায়িকা সবুজ বেনারসি শাড়ি পরেছেন। গায়ের সব অলঙ্কার ওজন করলে সের খানেকের কম হবে না। নায়কের গায়ে জরির কাজ-করা সিল্কের পাঞ্জাবি-পায়জামা আর প্ল্যাটফর্ম হিল স্যান্ডেল। স্যান্ডেলের হিল কম করে হলেও চার ইঞ্চি উঁচু। আমি একজন অল্পবয়সী এ্যাসিস্টেন্টকে বললাম, 'রূপকথার রাজারা কি প্ল্যাটফর্ম হিল স্যান্ডেল পরতো?'

প্রায় আমাদের বয়সী এ্যাসিস্টেন্টটি বলল, 'নায়ক একটু বেঁটে বলে সব সময়

ওকে প্ল্যাটফর্ম হিল পরতে হয়। রূপকথার ছবিতে ওঁর ফুলশট কখনো নেয়া হয় না। এমনিতে উনি ম্যাডামের চেয়ে একটু বেঁটে।'

ছবির এ্যাসিস্টেন্ট বা প্রোডাকশনের লোকেরা নায়িকা উর্মিলাকে ডাকে ম্যাডাম। মেজদা শুধু উর্মিলা ডাকেন। মেজদার পুঁচকে এ্যাসিস্টেন্টটি আমাকে চোখ মটকে ফিস ফিস করে বললো, 'পল্টু ভাইর সঙ্গে ম্যাডামের বিয়ে হচ্ছে খুব শিগগিরই।'

আমি ভীষণ অবাক হলাম। কথাটা সোনিয়াকে না বলে পারলাম না। সোনিয়া শুধু বলল, 'ভালোই তো। তোদের চমৎকার সুন্দর একটা ভাবী হবে।'

স্যুটিং-এর সময় একবার দারুণ এক মজার ব্যাপার ঘটে গেলো। নায়ক আব্বাস করুণ সুরে গানটি গেয়ে নায়িকার পেছন-পেছন দৌড়োচ্ছেন ঠিক তখনই তিনি পা মচকে পড়ে গেলেন। দুঃখের গান থামিয়ে 'বাবারে' বলে নায়কসম্রাট আব্বাস পা চেপে ধরে ঘাসের উপর বসে রইলেন। ইউনিটের সবাই দারুণ ব্যস্ত হয়ে শুকনো মুখে সেদিকে ছুটে গেলো। সোনিয়া আর আমি তখন হাসি চাপতে গিয়ে বারবার কেঁপে উঠছিলাম। পরে থাকতে না পেরে আমরা দুজন বাগানের বাইরে এসে হাসতে হাসতে খুন হয়ে গেলাম। আমার মনে হয় স্যুটিং-এর সময় বা ঘটে সেসব কথা নিয়ে যদি একটা ছবি বানানো যায়, তাহলে সেটা পৃথিবীর সেরা হাসির ছবি হবে। সোনিয়াকে বললাম, 'রাজকন্যা কঙ্কাবতী একটা দারুণ হাসির ছবি হবে।'

সোনিয়া হাসতে হাসতে বললো, 'হাসির নয় বরং হাস্যকর ছবি। উহ্, দুঃখের দিনেও নায়িকা টকটকে লিপস্টিক আর নেলপলিশ লাগাতে ভোলে নি। সারামুখে কত রকমের রঙই না মেখেছে। অবশ্য রাজকন্যাদের ব্যাপার-স্যাপারই অন্যরকম।'

আমি বললাম, 'মেজদার পুঁচকে এ্যাসিস্টেন্টটা বলেছে এ তো আর সাধারণ মানুষের দুঃখ নয়। রাজকন্যার রাজকীয় দুঃখ। রাজকন্যারা সবসময় বেনারসি পরেন যে।'

সোনিয়া বললো, 'কেন শহুরে মেয়েরা পরে না? সেদিন একটা বাংলা ছবি দেখেছি। ওতে শহুরে নায়িকাটির শাড়ি আর গয়নাপত্তর এই রাজকন্যার চেয়ে কম ছিলো না।'

'আহা বুঝিস না কেন? বেচারাদের যে একসেট গয়নাই আছে। চাষীর মেয়ের পার্ট করলেও ওটাই পরতে হয়।'

আমার কথা বলার ধরন দেখে সোনিয়া হেসে গড়িয়ে পড়লো।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

সোনিয়ার হাত ধরে যখন ওদের বাসায় গেলাম, হাসি খালা তখনো লনে বসে উল বুনছিলেন। আমাদের দুজনকে দেখে বললেন, 'আর দুজন কোথায়?"

আমি বললাম, 'ওরা স্যুটিং শেষ না করে আসবে না।'

স্যুটিং-এর সময় রামু-বিজু সোনিয়াকে আমার সঙ্গে দেখে একটা কথাও বলে নি। এমনভাবে ওরা স্যুটিং দেখছিলো যে আমাদের দেখতেই পায় নি। আমি শুধু আসার আগে বলে এসেছি, 'বাড়ি ফেরার পথে হাসি খালাদের বাসা হয়ে যাস।'

হাসি খালা বললেন, 'ঠিক আছে। ততক্ষণে আমরা এক কাপ চা খেতে পারি।'

সোনিয়া চায়ের কথা বলার জন্যে ভেতরে চলে গেলো। আমি বললাম, 'দুলালদাকে আপনার কথা বলেছি হাসি খালা। শুনে তিনি খুব খুশি হয়েছেন। বলেছেন, আপনার কথা সবসময় ওঁর মনে থাকবে। কয়েকদিন পরে তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।'

হাসি খালা উল বুনতে বুনতে বললেন, 'ওদের কোনো কাজে লাগতে পারলে আমি খুবই খুশি হবো। অয়নকে ওর বাবা জোর করে কানাডা পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি চেয়েছিলাম অয়ন দেশে থাকুক।'

হাসি খালা দুলালদাকে নিয়ে তাঁর ছেলের দুঃখ ভুলতে চাইছেন। হাসি খালা হয়তো জানেন না দুলালদারা অন্যরকম ছেলে। দিদা তো দুলালদাকেই বলেছেন, তোদের বেঁধে রাখা যায় না। আমার কেন যেন মনে হলো দুলালদার জন্যেও হাসি খালা দুঃখ পাবেন। অনেক মানুষ আছে যাদে গোটা জীবনটাই দুঃখে ভরা থাকে। হাসি খালা ঠিক সেরকম একজন।

সোনিয়া চা নিয়ে এলো। হাসি খালা সোনিয়া আর আমি চুপচাপ বসে চা খেলাম। হাসি খালার উল বোনার ভঙ্গিটি ভারি সুন্দর। তাঁর আঙুলগুলো দেখে মনে হল একটা সোনালি প্রজাপতি বুঝি এক ছন্দের গতি নিয়ে সবুজ ঝোপের ভেতর উড়ে বেড়াচ্ছে।

লনের উপর থেকে শেষ বিকেলের মিষ্টি রোদ সরে গিয়ে ইউক্যালিপটাসের পাতা জড়িয়ে কিছুক্ষণ পড়ে রইল। আমি ইউক্যালিপটাসের পাতায় রোদের খেলা দেখছিলাম। আরো কিছুক্ষণ পর রামু আর বিজু এলো। দুজনের মুখে চাপা উত্তেজনা আর আনন্দ। বিজুর চোখ দুটো রীতিমতো জ্বলজ্বল করছে। হাসি খালা ওদের দেখে মৃদু হেসে বললেন, 'স্যুটিং দেখাটা ভারি মজার তাই না?'

বিজু বলল, 'দারুণ মজার! হাসি খালা, কাল যাবেন দেখতে?'

হাসি খালা মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন— 'আমাদের মতো বুড়োরা কি স্যুটিং দেখে!'

রামু আমার কানে ফিসফিস করে বললো, 'উর্মিলা আমাদের সঙ্গে কথা বলেছে। দু'প্যাকেট চুইংগাম দিয়েছে।'

রামুর চুইংগামের ব্যাপারে আমি বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখালাম না। ওরা যখন উর্মিলার সঙ্গে কথা বলছে তখন আমি সোনিয়ার সঙ্গে বসেছিলাম। উর্মিলা যে ওঁদের সঙ্গে কী কথা বলতে পারেন সেটা আমার জানা আছে। কোন্ ক্লাশে পড়, বড় হলে কী করবে কিংবা মেজদার ছবি দেখ কিনা—এসব কথা ছাড়া উর্মিলার সঙ্গে ওদের অন্য কোনো কথা হতে পারে না।

সন্ধ্যের পর আমরা বাড়ি ফিরে গেলাম। কমেডিয়ান আলতামাস, ছোড়দাদের নাটকের সংলাপ শিখিয়ে দিচ্ছিলেন। মেয়েদের সংলাপ বলার সময় আলতামাস গলাটাকে একেবারে মেয়েদের মতো করে ফেলছিলেন। আবার লুৎফার গলা একরকম, আলেয়ার গলা আরেকরকম। আমরা তিনজন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সেই অভূতপূর্ব সংলাপ শুনলাম। নবাব সিরাজউদ্দৌলা, আলেয়া আর লুৎফার ভূমিকায় আলতামাসকে একসঙ্গে কল্পনা করে আমরা হাসতে হাসতে বিছানায় গড়াগড়ি খেলাম।

সন্ধ্যের পর থেকেই আকাশে মেঘ জমছিলো। দুলালদার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে বিজু খেয়েদের ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি আর রামু ছাদে পায়চারি করছিলাম। এলোমেলো ঝড়ো বাতাসে ঝাউবনের ভেতর থেকে শনশন শব্দ ভেসে আসছিলো। দুলালদা এলেন অনেক রাতে। বললেন, 'বাড়িতে সবাই আজ জেগে রয়েছে দেখছি।'

রামু বললো, 'মেজদা এসেছেন যে। কত কী মজা করলাম আমরা!'

আমি বললাম, 'চলুন দুলালদা আগে খেয়ে নি। পরে গল্প করা যাবে।'

দুলালদা বললেন, 'তাই ভালো। তোমাদের সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা আছে।'

খাবারের আয়োজন দেখে দুলালদা ভারি খুশি। বললেন, 'দুপুরে শুধু পোড়া শুটকি মাছ আর একটু মদ খেয়েছি।'

রামু বললো, আপনি মদ খান দুলালদা?'

দুলালদা হাসলেন—'সখ করে খাই না। মদ খাসিয়াদের কাছে খুবই পবিত্র এবং প্রিয় পানীয়। একেবারে যে গরিব, যার একবেলা ভাত জোটে না, তার ঘরেও যবের তৈরি মদ থাকে। একবার সাঁওতালদের এলাকায় মদ খেতে রাজি হই নি বলে ওরা খুব বিরক্ত হয়েছিলো।'

আমি বললাম, 'কী মজা দুলালদা তাই না? আমি কোথায় যেন পড়েছি সাঁওতালরা মহুয়ার রস দিয়ে যে মদ বানায় ওটা খেতে নাকি দারুণ লাগে।'

দুলালদা বললেন, 'কোনো মাতাল লিখেছে হয়তো। মদ খেলে দুর্গন্ধে আমার বমি আসতে চায়।'

খেয়ে উঠে সিগারেট ধরিয়ে দুলালদা বললেন, 'তোমাদের মেজদা আবার এদিকে ঢু মারবেন না তো?'

রামু হেসে বললো, 'দিদা আছেন কী করতে।'

দুলালদা বললেন, 'তোমাদের তো দুমাস বন্ধ আছে। পড়াশোনার চাপও নেই। আমি একটা কাজ দিতে চাই তোমাদের।'

রামু ব্যস্ত গলায় বললো, 'কী কাজ দুলালদা?'

দুলালদা বললেন, 'আমি ভাবছি পিয়াইন নদীর তীরে খাসিয়াদের যে গ্রামগুলো আছে, সেখানে তোমরা একটা স্কুলে চালাবে। আগে খ্রিস্টান মিশানারিরা ওদের কিছু লেখাপড়া শিখিয়েছিলো। আমি কথা বলে দেখেছি, শেখার জন্যে ওদের আগ্রহও আছে। ছেলেবুড়ো সবাই তোমাদের ছাত্র হবে। আসলে ব্যাপারটা কী জানো, লেখাপড়া না জানার জন্যে ওদের ওপর অত্যাচার করাটা এত সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে কল্পনাও করতে পারবে না। ধরো, ওরা মহাজনের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিলো কিংবা একটা কিছু বন্ধক রাখলো। মহাজন এমন একখানা অঙ্কের হিসেব ওদের বুঝিয়ে দিয়ে ঘরবাড়ি-জমি-জিনিসপত্র সব কিছু নিজে পরম নিশ্চিন্তে হজম করে ফেলে যে, এরা কিছুই বুঝতে পারে না। শুধু বোঝে এরকম হওয়া ঠিক নয়। গত বন্যার সময় বহু কৃষক পরিবার সর্বস্বান্ত হয়েছে, অনেকে না খেয়ে মরেছে। একবার ওরা মহাজনের ধানের গোলা লুট করতে গিয়েছিলো বলে মহাজনটি এখন আর গোলায় ধান রাখে না। বর্ডারের ওপারে পাচার করে দেয়। ওখানে তোমাদের স্কুল থাকলে আমাদের কাজের সুবিধে হবে।'

রামু বললো, 'স্কুলে না হয় আমরা পড়াতে পারবো। কিন্তু জিনিসপত্র কোথায় পাবো? শহীদ মামা আমাদের স্মাগলিং-এর কথা বলেছেন। আমি ভাবছি—'

এমন সময় দিদা একটা প্লেট হাতে করে ঘরে ঢুকলেন। দুলালদাকে দেখে হেসে বললেন, 'পল্টুর জন্যে পুডিং রেঁধেছিলাম। দেখ্ তো কেমন হয়েছে? ছাতক থেকে আবুর বাপ কমলা পাঠিয়েছে। অনেকদিন কমলার পুডিং করি না।'

আমি হেসে বললাম, 'সবগুলো পুডিং দুলালদা একা খাবে নাকি দিদা?

আমাদের খেতে বলবে না?'

'তোদের না বললেও খাবি।' এই বলে দিদা টেবিলের ওপর প্লেটটি নামিয়ে খাটের ওপর উঠে বসলেন। বাইরে দমকা বাতাসের শব্দ শুনে তিনি বললেন, 'আজ রাতে ঝড় আসতে পারে। সাবধানে থাকিস।'

আমরা সবাই পুডিং শেষ করে এসে দিদাকে ঘিরে বসলাম। দুলালদা বললেন, 'খাসিয়াদের গ্রামে একটা স্কুল খোলার কথা ওদের বলছিলাম। ওরা যদি ছুটির এই দু'মাস সন্ধ্যেবেলা দু'তিন ঘন্টা করে পড়াতো, তাহলে গ্রামের মানুষগুলোর খুব উপকার হতো।'

দিদা মুখ টিপে হেসে বললেন, 'গলা কাটা বাদ দিয়ে এখন বুঝি মিশনারি ফাদার হয়েছো দুলাল? কদিন আগেও মিশনারিরা খাসিয়াদের গ্রামে গিয়ে বলতো, আইস ভ্রান্ত মেষশাবকের দল। যিশুকে ভজনা কর, পরিত্রাণ মিলিবে। খাসিয়া বেচারারা ওদের কথাবার্তা কিছু বুঝতো না, শুধু হা করে থাকতো।'

দুলালদা হেসে বললেন, 'আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী দিদা। আমি গ্রামের এসব স্থানীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে গরিব কৃষকদের একজোট করতে চাই। আমি চাই ওদের সমস্যা ওরা নিজেরা বোঝার চেষ্টা করুক। সমাধানের পথও নিজেরা খুঁজে বের করুক। আমি শুধু ওদের সঙ্গে থাকবো। ওদের কাছ থেকে শিখবো। ওদের ভুলভ্রান্তি হলে দেখিয়ে দেবো। আমাদের দেশের শতকরা আশিভাগ মানুষের অক্ষরজ্ঞান নেই। যে-জন্যে ইচ্ছেমতো ওদেরকে শোষণ করা যায়। আজ যদি এরা সবাই একসঙ্গে জোট বেঁধে সরকারের টাউট-নেতা আর ওপার থেকে আসা মাড়োয়ারিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতো, তাহলে একদানা চালও ইন্ডিয়া যেতে পারতো না, আর এদেশের মানুষ এভাবে না খেয়ে মরতো না। সময় অনেক বদলে গেছে দিদা। আমরা যাদের সর্বাহারা শ্রেণী বলি, যাদের জন্যে আমরা লড়ছি; তাদের চেতনার স্তর যদি বাড়াতে না পারি যত গাল ভরা তত্ত্ব কথাই ওদের বলি না কেন, কোনো লাভ হবে না।'

দিদা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কথাটা আমিও বহুবার ভেবেছি দুলাল। একবার কুটুকে বলেছিলাম, তোদের কর্মীরা গ্রামে কাজ করে। কী করে তোরাই জানিস। তবে আমার মনে হয় গ্রামের মানুষদের কিছু লেখাপড়া শেখালে ওদের উপকার হতো। তোরা তো একটা গ্রামে চিরকাল পড়ে থাকিস না। শুনে কুটুই বললো, দিদা তুমি কি আমাদের মিশানারি ভেবেছো নাকি? আমি বিপ্লবকে করে নিই। তারপর একবছরেই দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করে ফেলব। এখন ভাবি কোথায় গেলো কুটু আর কোথায় গেলো ওদের বিপ্লব! দেশের মানুষ এখনো সেই অন্ধকারেই পড়ে আছে।'

দুলালদা বললেন, 'একেবারেই যে অন্ধকারে পড়ে আছে তা কিন্তু নয় দিদা। একবার যেখানে আমরা কাজ করেছি সেখানে কৃষকরা কিছুটা হলেও সচেতন

হয়েছে। তবে আমরা খুব কম কৃষক-শ্রমিককেই সচেতন করতে পেরেছি। স্কুল খোলার ব্যাপারে আপনি কিছু পরামর্শ দিন দিদা। স্কুলে শুধু ক খ শেখানো হবে না। ওটা হবে আমাদের স্কুল।'

দিদা বললেন, 'আমি আর কী বলবো! কিছু টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। শীত এসে গেছে। ওদের জন্যে কিছু কাপড়চোপড়ও ঘুরেফিরে জোগাড় করতে পারবো। সেদিন আমাদের মালি দারুভূই বলছিল শীতে ওরা সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায়। আগুন জ্বেলে আর কতক্ষণ শীত তাড়ানো যায়! গেল বছরও শীতে আর অনাহারে খাসিয়াদের গ্রামে আশিজন মানুষ মরেছে।'

দুলালদা গম্ভীর গলায় বললেন, 'আপনি একজন সত্যিকারের বিপ্লবী হতে পারবেন দিদা।'

আমাদের বুড়ো দিদা লজ্জায় লাল হয়ে বললেন, 'থাক থাক, এ-বয়েসে আমাকে বিপ্লবী বানিয়ে কোনো কাজ হবে না। আমি বাছা বন্দুক-টন্দুক চালাতে জানি না। বরং ইশকুলের হেডমাস্টারনি বানাতে পারো আমাকে। আমি ভালো চালাতে পারবো।'

আমরা সবাই দিদার কথা শুনে হেসে ফেললাম। রামু বলল, 'দিদাকে আমরা আমাদের নেতা বানাবো?'

দিদাও বললেন, 'বাজে বকিসনে ছোঁড়া!'

দুলালদা মৃদু হেসে বললেন, 'আমরা তো এখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্যে লড়ছি না। আমরা লড়ছি জাতীয় মুক্তি আর গণতন্ত্রের জন্যে। শুধু কমিউনিস্টরা কখনো এই বিপ্লব করতে পারে না। দেশকে যারা ভালোবাসেন, যাঁরা মানুষের ভালো চান, স্বাধীনতা চান, তাঁদের সবাইকে নিয়ে এই বিপ্লব করতে হবে। আপনি আপাতত স্কুল নিয়েই থাকুন। তারপর লড়াই যখন শুরু হবে তখন ঠিকই আপনি লড়াই করবেন। তবে এখানে আপনারা অনায়াসে মহিলা সমিতি জাতীয় কিছু করতে পারেন। আপনি জাফলং-এর মানুষদের জন্যে যা করছেন, সেটা সবাইকে নিয়ে একটা সাংগঠনিক কাঠামোর ভেতর দিয়ে করলে, কাজ অনেক ভালোভাবে করা যায়।'

দিদা একগাল হেসে বললেন, 'ওটা আমি যে-কোনো সময় শুরু করতে পারবো। মহিলা সমিতি করলে তোমাদেরও কাজের সুবিধে হবে। আমাদের ইশকুলটাও ভালোমতো চালানো যাবে। আমার ছেলেরা যখন আমার নাতিদের বয়সী ছিলো তখন আমি মহিলা সমিতি করেছি।'

সেই রাতে আমরা দিদাকে নিয়ে বহুক্ষণ স্কুল আর মহিলা সমিতির বিষয় নিয়ে কথা বলেছিলাম। স্কুলের পড়ানোর কথা শুনে আমি আর রামু যে কী পরিমাণ উত্তেজিত হয়েছিলাম সে কথা আর বলার নয়। মহিলা সমিতি সম্পর্কেও আমাদের উৎসাহ কম ছিলো না, কারণ সেখানে হাসি খালাও

থাকবেন। সোনিয়া তো থাকবেই।

দুলালদা আর দিদা কথা বলছিলেন। আমরা তিনজন লেপ মুড়ি দিয়ে চুপচাপ শুনছিলাম। বাইরে তখন ঝড়ো বাতাস ঝাউবনে অবিরাম হুইসেলের শব্দ তুলে বয়ে যাচ্ছিলো।

বিস্ময়ের চরম সীমানায়

সারারাত প্রচণ্ড ঝড় আর বৃষ্টিতে আমরা বহুক্ষণ ঘুমোতে পারিনি। দিদা চলে যাওয়ার পরও আমরা অনেক রাত অব্দি জেগেছিলাম। দুলালদা খাসিয়াদের গ্রামে কাজ করার অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন। তিনি এখন গ্রামের কৃষকদের অবস্থা তদন্ত করছেন। ওদের গত দশ বছরের পুরো অবস্থাটা জেনে নিচ্ছেন। খাসিয়ারা দুলালদাকে খুব আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছে। কৃষক সমিতি সম্পর্কে ওরা দারুণ উৎসাহী। দুলালদা আগে ওদের ভেতর কাজ করেছিলেন। তখন তিনিও খাসিয়াদের ভাষাও শিখেছিলেন। দুলালদার মতে, কারো সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে গেলে, বিশেষ করে তারা যদি শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকে, তাহলে তাদের ভাষা অবশ্যই জানতে হবে। দুলালদা সাঁওতাল আর ওঁরাওদের ভাষায় চমৎকার কথা বলতে পারেন।

ভোরে আমার আর দুলালদার ঘুম একসঙ্গেই ভাঙলো। আমি উঠে রামুকেও ঘুম থেকে তুলে দিলাম। দুলালদা জানালা খুলে দিলেন। বাইরে ঘন কুয়াশা। সারা আকাশ মেঘে ঢাকা। হু হু করে গায়ে সূঁচ-ফোটানো ঠাণ্ডা ঝড়ো বাতাস বইছে। আমি বললাম, 'যাবেন কীভাবে দুলালদা?'

দুলালদা হেসে বললেন, 'না গেলে চলবে কী করে?'

চাদর মুড়ি দিয়ে আমরা তিনজন বেরিয়ে পড়লাম। বিজুর চাদরটা জোর করেই দুলালদার গায়ে জড়িয়ে দিলাম। বললাম, 'আজ বিজুকে ঘর থেকে বার করা যাবে না। মেজদা ওর জন্যে হেমেন্দ্রকুমারের রচনাবলী এনেছেন।'

দুলালদা মৃদু হেসে বললেন, 'তোমরা দুজন তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেছো। বিজু তোমাদের তুলনায় একটু পিছিয়ে আছে।'

আমি আর রামু কাঁধে হাত রেখে হাঁটছিলাম। দুলালদার কথা শুনে আমরা দুজন মুখ টিপে হাসলাম। বিজু কোনো-কোনো ব্যাপারে আমাদের চেয়েও বেশি বখে গেছে, এটা শুধু আমি আর রামুই জানি। আমরা সবাই শীতে কাঁপছিলাম।

কমলালেবুর বাগানের শেষপ্রান্তে এসে ঝর্নার দিকে তাকাতেই সবার মাথা ঘুরে গেলো। আমাদের পরিচিত ঝিরঝিরে ঝর্নাটির চেহারা একরাতেই একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। গত বন্যার সময় শুধু ঝর্নার এরকম চেহারা দেখেছিলাম। তখন তো বর্ষা ছিলো-বন্যার আগে থেকেই নদীর মতো হয়ে গিয়েছিলো। এখন ঝর্নাটি উত্তাল নদীর মতো ফুলেফেঁপে প্রচণ্ড শব্দ করে বয়ে চলেছে। পাহাড় থেকে বড়বড় পাথর স্রোতের টানে গড়িয়ে আসছে। একটানা চাপা গর্জন শোনা যাচ্ছে। ঝর্নার এরকম শব্দ আমি আগে কখনো শুনিনি।

দুলালদা শুকনো মুখে বললেন, 'যাবো কী করে? একেবারেই যে যাচ্ছেতাই অবস্থা হয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'আপনি খেপেছেন দুলালদা। পানিতে নামার সঙ্গে সঙ্গে আপনি ছাতু হয়ে যাবেন।'

রামু বলল, 'দুলালদা ফিরে চলুন।'

দুলালদা কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'দিনের বেলায় তোমাদের ওখানে থাকি কী করে! মেজদা এসেছেন। অন্য কেউ কোনো দরকারে ছাদে উঠতে পারে। বিজুর কথামতো সারাক্ষণ খাটের নিচে লুকিয়ে থাকা যায় নাকি!'

আমি হেসে বললাম, 'থাকার জন্যে আপনি মোটেই ভাববেন না দুলালদা। আপনি হাসি খালাদের বাসায় থাকবেন। তিনি আপনাকে দেখলে দারুণ খুশি হবেন।'

দুলালদাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আমরা দুজন তাঁর দু'হাত ধরে সোনিয়াদের বাসায় নিয়ে এলাম। কালকের মতো সোনিয়া ছোট্ট কাঠের গেটটার পাশে ঘুমঘুম চোখে দাঁড়িয়েছিলো। ওর হাতে দুটো লাল গোলাপ। আমাদের সঙ্গে দুলালদাকে দেখে সোনিয়া ভারি অবাক হলো।

রামু বললো, 'দেখ সোনিয়া কাকে এনেছি। দুলালদা আজ তোদের বাসায় থাকবেন।'

'সত্যি বলছিস রামু?' বলে সোনিয়া হাসি খালাকে ডাকতে ডাকতে দৌড়ে ঘরের দিকে গেলো।

আমরা ভেতরে ঢুকলাম। হাসি খালার লনে সবুজ ঘাসের ডগায় রূপোলি শিশিরকণা জমে আছে। দুলালদা বললেন, 'ভারি সুন্দর লন। হাসি খালা নিশ্চয় বাগান খুব ভালোবাসেন।'

হাসি খালা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দুলালদার কথা শুনে মৃদু হাসলেন। বললেন, 'এসো ভেতরে এসো।'

আমাদের তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে হাসি খালা খাবার ঘরে গিয়ে বসলেন। টেবিলে সাদা মোরগের মতো দেখতে একটা টিকোজির পাশে ধবধবে সাদা টি-পট। সাদা বোধ হয় হাসি খালার প্রিয় রঙ। দেয়াল থেকে শুরু করে টেবিলক্লথ, চেয়ারের কুশন, চায়ের কাপ সবই সাদা। হাসি খালার পরনে আগের মতোই সাদা শাড়ি। কলেজের মেয়েদের মতো ধবধবে সাদা কার্ডিগান পরেছেন। হাসি খালার ঘরে ঢুকলে মনটা অদ্ভুত সুন্দর এক প্রশান্তিতে ভরে যায়।

ঝর্নার কথা শুনে হাসি খালা বললেন, 'রাতে বৃষ্টির জন্যে এরকম হয়েছে। পাহাড়ের পানি নেমে গেলেই আবার আগের মতো হয়ে যাবে।'

দুলালদা বললেন, 'রাতে ঝড়ও কম হয়নি। আমি ভাবছি গ্রামের ওরা কী অবস্থায় আছে! ঘরটর সব হয়তো উড়ে গেছে।'

হাসি খালা বললেন, 'কাল সকালেই যেতে পারবে, এখন তো আর বর্ষাকাল নয়।'

সোনিয়া বললো, 'অবশ্য আজ যদি বৃষ্টি না হয়।'

দুলালদা মৃদু হেসে বললেন, 'বৃষ্টির কথা আর মুখে এনো না সোনিয়া। শীতকালের বৃষ্টির মতো বিরক্তিকর আর কিছু হয় না।'

সোনিয়াদের বেঁটেখাটো নেপালি বাবুর্চি রামথাপা চায়ের পটে করে গরম পানি আনলো। হাসি খালা বড়বড় চায়ের পাতা ভিজিয়ে কিছুক্ষণ টিকোজি দিয়ে ঢেকে রাখলেন। মৃদু হেসে বললেন, 'সকালে আমার কয়েক কাপ চা খাওয়া হয়।'

রামু বললো, 'এরকম চা পেলে আমি সারাদিন খেতাম।'

হাসি খালা বললেন, 'এবার বাগান থেকে এলেই পাঠিয়ে দেবো।'

চা খেয়ে আমরা দুজন উঠে পড়লাম। ওদিকে হয়তো মেজ জেঠিমা আমাদের মুণ্ডুপাত করছেন। দুলালদাকে বললাম, 'বিকেলে চা খেতে আসব। তখন দেখা হবে।'

সোনিয়া আমাদের সঙ্গে গেট পর্যন্ত এলো। গোলাপ দুটো সোনিয়া ললিপপের মতো ধরে রেখেছিলো। আমি বললাম, 'আজ যে দুটো গোলাপ সোনিয়া?'

সোনিয়া বললো, 'আজ তোরা দুজনেই ভালো কাজ করেছিস। অবশ্য ঝর্নাকেও একটা দেয়া উচিত।'

সোনিয়া আমাদের দুজনকে গোলাপ দুটো দিলো। সারা পথ গোলাপের গন্ধে বিভোর হয়ে বাড়ি ফিরলাম।

ঘরে ঢুকতেই বিজু বললো, 'নিচে যাও, মেজ জেঠিমা মর্নিংওয়াক করার মজা দেখাবেন।'

বিজু বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে 'হিমালয়ের ভয়ংকর' পড়ছিলো। রামু বললো, 'মা খুব রেগে আছেন নাকি বিজু?'

বিজু হেসে বললো, 'রেগেছিলেন বৈকি। দিদা রাগের গোড়ায় পানি ঢেলে দিয়েছেন। বলেছেন, সকালে মর্নিংওয়াক করলে শরীর ভালো হয়।' জেঠিমা পরে বলেছেন, 'এই কাজটি তো ছাদেও করা যায়। এই শীতের ভেতর বাইরে যেতে হবে কেন!'

আমি হেসে বললাম, 'দিদা যতদিন আছেন ততদিন আমাদের কোনো ভাবনাই নেই।'

রোদ নেই বলে সেদিন মেজদার স্যুটিং হলো না। দুপুর পর্যন্ত আমরা মেজদার ঘরে বসে গল্প করলাম। মেজদা একসময় বললেন, 'এসব যাচ্ছেতাই ছবি বানাতে আর ভাল্লাগছে না। আমি ঠিক করেছি একটা মনের মতো ছবি বানিয়ে আবার লেখার জগতে ফিরে যাবো।'

উর্মিলাদি গম্ভীরমুখে মাথা নেড়ে সায় জানালেন। ছবির নায়িকা উর্মিলাকে মেজদা বলেছেন উর্মিলাদি ডাকতে। তিনিও আমাদের সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন। সাজগোজ না করলে উর্মিলাদিকে খুবই সুন্দর দেখায়। রঙটা যদিও ফর্শা নয়— তবে ফর্শা হলে তাঁকে এতটা ভালো লাগতো না।

দুপুরে আমাদের খাওয়ার জন্যে ডাকতে এসে দিদা মেজদাকে বললেন, 'এই যে পল্টু। তোকে একটা কথা বলব ভেবেছিলাম। পচা-পচা ছবি বানিয়ে টাকা পয়সা তো কম রাজগার করিসনি। অনেক আজেবাজে লোকের বিস্তর কালো টাকা সাদা করে দিয়েছিস। এখন সৎপথে কিছু টাকা ব্যয় কর।'

মেজদা হেসে বললেন, 'অত ভূমিকা না করে বললেই পারো তোমার কিছু টাকার দরকার।'

দিদা বিরক্ত হওয়ার ভান করে বললেন, 'আহ পল্টু, সবকিছু এত সংক্ষেপে বুঝতে যাওয়া ভালো নয়। টাকা আমার জন্যে নয়। আমি ভাবছি বুড়ো বয়েসে কিছু সমাজসেবা করবো। গ্রামে একটা ইশকুল করার ইচ্ছে আছে আমার।'

আমি আর রামু কোনরকমে হাসি চাপলাম।

মেজদা আগের মতো হেসে বললেন, 'ঠিক আছে দিদা। কিছু টাকা নিশ্চয়ই দেবো। কত দিতে পারবো তোমাকে পরে জানাচ্ছি। তবে এরজন্যে আমার টাকাকে গালি দিচ্ছো কেন? অসৎ পথে টাকা রোজগার করতে হলে, এদ্দিনে ছবি না বানিয়ে মন্ত্রী হতাম।'

'তোর মুরোদ আমার জানা আছে।' বলে দিদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মেজদা উর্মিলাদিকে বললেন, 'দিদার মতো মানুষ আজকাল খুব কমই দেখা যায়। আমি জানি দিদা একবার যখন বলেছেন, স্কুল না বানিয়ে ছাড়বেন না।'

বিকেলে আমরা যখন বেরুতে যাবো তখনই ঝরঝর করে বৃষ্টি নামলো। সন্ধ্যে অবধি এমনই অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরতে লাগলো, মনে হল চেরাপুঞ্জির সব মেঘ বুঝি পথ ভুল করে আমাদের জাফলং-এ চলে এসেছে।

সন্ধের পর বৃষ্টিটা একটু ধরে এলো। আমরা সবাই সোনিয়াদের বাসায় যাওয়ার জন্যে এতক্ষণ বৃষ্টির মুণ্ডুপাত করছিলাম। বৃষ্টি কমতেই রামু বলল, 'চল্, সোনিয়াদের বাসা থেকে এক্ষুনি একবার ঘুরে আসি। দুলালদা—'

রামুর মুখের কথা মুখে রইলো। রামুর পেছনে চোখ পড়তেই আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। বড়দা এসে দাঁড়িয়েছেন আমাদের দরজায়। আমি শুধু বললাম, 'একী বড়দা আপনি!'

রামু সঙ্গে সঙ্গে পেছনে তাকালো। বিজু বই ফেলে খচমচ করে উঠে বসলো। আমাদের তিনজনের মুখ হা হয়ে গেলো। বড়দার জামাকাপড় সব ভেজা। চুলের ডগায় পানির ফোঁটা জমে আছে। বড়দা কাঁপতে কাঁপতে মৃদু হাসলেন। বললেন, 'চ্যাঁচাবি না, জেল থেকে পালিয়ে এসেছি। জলদি শুকনো কাপড় বের করে দে। শীতে একেবারে জমে গেছি। আবু, নিচে গিয়ে দিদার কানে কানে শুধু বলবি, আমি এসেছি।'

আমি এক ছুটে নিচে নেমে গেলাম। দিদা রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিলেন। কথাটা বলতেই তাঁর হাত থেকে চায়ের কাপটি পড়ে ভেঙে গেলো।'

পচার মা ছুটে এসে বললো, 'ও কি মা, কাপ ভাঙলো কী করে?'

দিদা ওকে ধমক দিয়ে বললেন, 'তুই নিজের চরকায় তেল দে পচার মা। বাড়িতে তুই ছাড়া আর কেউ বুঝি কাপ ভাঙতে পারবে না?'

'আমি কি তাই বলেছি?' বলে এতটুকু জিব কেটে পচার মা বেরিয়ে গেলো।

আমি আর দিদা চিলেকোঠার ঘরে ঢুকে দেখি বড়দা লেপ মুড়ি দিয়ে বিছানার ওপর বসে আছেন। দিদাকে দেখে বললেন, 'ভালো আছো তো দিদা! তোমাকে দেখার জন্যে জেল থেকে পালিয়ে চলে এলাম।'

দিদা কাছে গিয়ে বড়দার কপালে চুমু খেয়ে বললেন, 'আমি জানতাম তুই আসবি। কবে বেরিয়েছিস জেল থেকে? পথে কোনো বিপদ হয়নি আসতে?' তারপর দিদা বিজুকে বললেন, 'দৌড়ে রান্নাঘরে যা বিজু। কেতলিতে চা বানানো আছে। এখনি বানিয়েছি। এককাপ চা আর কখানা বিস্কুট নিয়ে আয়।'

বিজু দৌড়ে নিচে চলে গেলো। বড়দা মৃদু হেসে বললেন, 'এখনো তুমি সবদিকে নজর রাখতে পারো দিদা। আমি জেল থেকে বেরুইনি। ঢাকা থেকে কুমিল্লা নেয়ার পথে ট্রেন থেকে পালিয়েছি। আজ নিয়ে মোট উনিশ দিন হলো; এতদিন টঙ্গীর এক পুরোনো এলাকায় লুকিয়েছিলাম।'

রামু বললো, 'ট্রেন থেকে কী করে পালালেন বড়দা, সে কথা আগে বলুন।'

দিদা কটমট করে রামুর দিকে তাকালেন। বড়দা হেসে বললেন, 'যাচ্ছিলাম ট্রেনে করে। সঙ্গে গার্ড ছিল দু'জন, আর একজন পুলিসের সাব-ইন্সপেক্টর! খুব ভদ্র আর নিরীহ কয়েদি ছিলাম বলে হাতকড়া লাগায়নি। ট্রেনে লোকজনও খুব বেশি ছিলো না। একটা খোলা পুল পার হবার সময়ই দরজা দিয়ে বাইরে লাফ

দিয়েছিলাম। পানিতে ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই শুনি গুলির শব্দ। ট্রেন থামতে থামতে সাঁতরে আমি অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম! তবে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে একট পচা লাশ। কয়েকদিন গ্রামে লুকিয়েছিলাম। সেখানে থাকতে খবর পেলাম, পুলের কাছে একটা গুলি-খাওয়া লাশ পাওয়া গেছে। চেহারাটা চেনা যায়নি। একেবারেই ডিকম্পোজড হয়ে গেছে। পুলিস রিপোর্ট পাঠিয়েছে লাশটা যে আমার এ-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই!'

দিদা বললেন, 'পুলিশ তো আমাদের কিছুই জানায় নি!'

বিজুর আনা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বড়দা বললেন, 'এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন, ওদেরকে কাগজপত্তোর তৈরি করার সময় দেবে না?'

'তুই এখন এলি কোত্থেকে?'

'ছাতকে মেজকার ওখানে ছিলাম গত দুদিন। মেজকা তো ওখানকার শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের ভেতর আমাদের লাইন নিয়ে দারুণ কাজ করছেন। মেজকা আমাকে বললেন, তুই নেই বলে কাজ কি থেমে থাকবে! একটা কিছু তো করতে হবে। তাই ট্রেড ইউনিয়নের মজুরদের রাজনীতির তালিম দিচ্ছি। আমি বলেছি, মেজকা আপনি এমন এক জায়গায় কাজ করছেন, আর এমন এক সময়ে বাস করছেন যখন চুপচাপ বসে থাকতে চাইলেই থাকা যায় না। কদিন পরে দেখলাম ওখানে থাকা নিরাপদ নয়। পুলিস আর আইবির লোক সারাক্ষণ ঘুরঘুর করছে। ভাবলাম এলাকায় যাওয়ার আগে তোমাকে দেখে যাই। মেজকা সঙ্গে আসতে চাইছিলেন। আমি বারণ করেছি। আমি চাই না আমার পালিয়ে আসার কথা কাকিমাদের কানে যাক। ওঁরা দুদিনেই তাহলে সবখানে জানিয়ে দেবেন।' এই বলে বড়দা আমাদের দিকে তাকালেন— 'বড়দাকে যদি ভালোবাসিস তাহলে এসব কথা কাউকেই বলতে পারবি না।'

বিজু বললো, 'দুলালদাকেও না?'

বড়দা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'দুলালদা কে?'

আমরা দিদার দিকে তাকালাম। দিদা আস্তে আস্তে বললেন, 'তোর মতোই একজন ইন্ডিয়া থেকে এসেছে।' তারপর দুলালদার সব কথা বড়দাকে খুলে বললেন, এমনকি ইশকুলের কথাও। বড়দা সব কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'ও এখন কোথায়?'

আমি বললাম, 'হাসি খালাদের বাড়িতে। আজ ঝর্নার ঢল নেমেছে বলে গ্রামে যেতে পারেন নি।'

বড়দা দিদাকে বললেন, 'খুবই বুদ্ধিমান ছেলে মনে হচ্ছে দিদা। ওর সঙ্গে আমি কথা বলবো।'

দিদা বললেন, 'তুইও তাহলে হাসিদের বাসায় চলে যা। আমাদের এখানে এখন অনেক লোকজন। পল্টু এসেছে, স্যুটিং করবে বলে। তাছাড়া তোর বাপ

টের পেলে হৈচৈ বাঁধাবে।'

বড়দা একটু বিব্রত হয়ে বললেন, 'হাসি খালার সঙ্গে যে আমার ভালো আলাপ নেই। কবে একবার কথা হয়েছিলো। তাছাড়া তাঁর ওখানে যাওয়া কি ঠিক হবে?'

বড়দাকে বাধা দিয়ে রামু বলল, 'হাসি খালার মতো ভালো মানুষ আর হয় না বড়দা। দুলালদার সঙ্গে কি আলাপ ছিলো নাকি! আসলে তিনি বিপ্লবীদের ভালোবাসেন।'

আমি বললাম, 'ওখানে আপনার কোনো অসুবিধে হবে না বড়দা। চলুন, দুলালদার সঙ্গেও দেখা হবে।'

বড়দা মৃদু হেসে বললেন, 'তোরা দেখছি অনেক বড় হয়ে গেছিস। এবার তোদের কাজে লাগাতে হবে।'

বিজু সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'দুলালদা আমাদের ইশকুলের কাজ দিয়েছেন।'

দিদা বললেন, 'গেলে তোরা এখনই বেরিয়ে পড়। কুটু, কাল রাতে অবশ্যই দেখা করবি। একবেলা তোকে নিজ হাতে রেঁধে না খাওয়ালে মনে শান্তি পাবো না।'

বড়দা উঠে গিয়ে দিদার পাশে দাঁড়ালেন। নিচু হয়ে দিদার কপালে চুমু খেয়ে বললেন, 'তুমি একটুও বদলাও নি দিদা।'

দিদাকে চুমু খেতে বড়দা ছাড়া অন্য কাউকে কখনো দেখিনি। আমি, রামু, বিজু, তিনজন একসঙ্গে হেসে ফেললাম। আমি বললাম, 'দিদার সব আদর শুধু বড়দার জন্যে।'

দিদা হেসে বললেন, 'চুপ কর নেমকহারাম। হাসিদের বাসায় গিয়ে আবার সোনিয়ার সঙ্গে জমে যাস নে।'

বড়দাকে নিয়ে হাসি খালাদের বাসায় গিয়ে দেখি দুলালদা, হাসি খালা আর সোনিয়া ড্রইংরুমে বসে আছে। দুলালদার গায়ে জলপাই রঙের নতুন সুয়েটার, যেটা হাসি খালাকে দেখেছি বুনতে। হাসি খালা বড়দাকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'কুটু কবে এলে?'

বড়দা মৃদু হেসে বললেন, 'আজই এসেছি। আপনার রান্নার অনেক প্রশংসা শুনেছি সেজ কাকিমার কাছে। তাই আজ এসে আর লোভ সামলাতে পারলাম না।'

হাসি খালা লজ্জায় লাল হলেন। বড়দা দুলালদাকে বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই দুলাল!'

দুলালদা হেসে বললেন, 'আর আপনি তো বড়দা! তারপর দুলালদা হাত মেলানোর জন্যে উঠে এলেন, বড়দা তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'আপনার কথা দিদার কাছে শুনেছি।'

হাসি খালা গভীর মমতাময় চোখে বড়দা আর দুলালদাকে দেখছিলেন। চশমার কাচের ভেতর তাঁর চোখ দুটো তখন ছলছল করছিল।

বড়দা আর দুলোলদা পাশপাশি একটা সোফায় বসলেন। দুলালদা বললেন, 'আবু রামু দাঁড়িয়ে কেন, বোসো।'

বড়দা বললেন, 'আজ ওরা বাড়ি চলে যাক দুলাল। কাল আমরা সাবই মিলে গল্প করবো।'

হাসি খালা মিষ্টি হেসে বললেন, 'সকালে তোমরা তাহলে এখানেই খেও।'

হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা

পরদিন সকালে আমরা মেজ জেঠিমাকে বলে হাসি খালাদের বাসায় চলে এলাম। আনন্দ আর উত্তজনার অথৈ সমুদ্রে ভাসছিলাম আমরা। বিজু ঘুম থেকে উঠে বলছিলো, 'আমার ইচ্ছা করছে, কিছুক্ষণ কোথাও বসে মনের সুখে কাঁদি।'

হাসি খালারা খাবারঘরে বসে কথা বলছিলেন। আমি গিয়ে সোনিয়ার পাশের চেয়ারটিতে বসলাম। রামু আর বিজু বসলো আমাদের মুখোমুখি, বড়দার দুপাশে। হাসি খালা সবাইকে সবুজ চা ঢেলে দিলেন।

বড়দা দুলালদাকে বললেন, 'তুমি কৃষকদের অবস্থা তদন্ত করা সম্পর্কে যে কথা বললে দুলাল, এখন সবার আগে এ-কাজটিই করতে হবে। কৃষক-শ্রমিকদের জানতে হবে! আক্ষরিক অর্থে নয়, পুরোপুরি একাত্ম হতে হবে ওদের সঙ্গে। পেটি বুর্জোয়া নেতৃত্বে আমার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। আমাদের এখানে যে এতগুলো কমিউনিস্ট পার্টি, এর প্রধান কারণ হচ্ছে পেটি বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব। পেটি বুর্জোয়া চিন্তা থেকে পার্টিতে আমলাতান্ত্রিকতা আসে। ব্যাপকভাবে কৃষক-শ্রমিক ক্যাডার পার্টিতে না থাকলে এবং তাদের রাজনীতি-সচেতন না করলে, এইসব পেটি বুর্জোয়া নেতৃত্ব আর উপদলীয় কোন্দল থামানো যাবে না। আমরা শুধু মুখেই বলি কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি অথচ শ্রমিকদের সত্যিকারের অবস্থা আমরা কিছুই জানি না। অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। পরিবর্তনের প্রতিটি ধাপ আমাদের জানা না

থাকলে আমরা সবসময় পেছনে পড়ে থাকবো।'

বড়দার অনেক কথা ঠিকমতো সবাই বুঝতে না পারলেও আমরা অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে ওঁর কথা শুনছিলাম। বড়দার কথাগুলোর সঙ্গে গভীর আন্তরিকতা মিশেছিলো, যে জন্যে প্রতিটি কথা আমাদের মনকে স্পর্শ করতে পেরেছিলো। বড়দা বললেন, 'আমি চিরকাল গ্রামে থেকে কাজ করেছি। সেদিন তিন বছর পর আবার গ্রামে গেলাম। তিন বছরের পরিবর্তন দেখে বিস্ময়ে আমি হতবাক হয়ে গেছি। আমাদের কৃষকরা হাল, গরু, জমি, ভিটেমাটি সব বিক্রি করে শহরের ফুটপাতে বসে বসে না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে। এর চেয়ে দুঃসময়ের কথা কি ভাবা যায় দুলাল? আমাদের দ্বন্দ্বগুলো এত পরিষ্কার, তবু আমরা বিপ্লবীরা একটি সঠিক নেতৃত্ব আর তত্ত্বে সজ্জিত কমিউনিস্ট পার্টিতে একত্রিত হতে পারছি না। ভবিষ্যতের মানুষ আমাদের এই অক্ষমতাকে কখনো ক্ষমা করবে না।'

দুলালদা বললেন, 'বড়দা আমি আর তত্ত্বের জটিলতায় ফিরে যেতে চাই না। আমি এখানেই থাকবো। এখানেই কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করবো, কৃষক সমিতি করবো, গোপনে পার্টি সংগঠন দাঁড় করাবো। বাংলাদেশের মানুষ কেন না-খেয়ে মরছে এই দুদিনে গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে কাজ করে আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি। কীভাবে ধান-চাল এখান থেকে ইন্ডিয়ায় পাচার হচ্ছে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। কারা এগুলো করছে তাও আমরা জানি। আমার কাছে বাংলাদেশে আর ভারতে কোনো পার্থক্য নেই। দুটো দেশেই আমাদের কমন এনিমির বিরুদ্ধে লড়তে হবে। জনগণের শত্রু দুটো দেশেই এক।'

বড়দা বললেন, 'তোমার সঙ্গে থেকে যেতে ভারি লোভ হচ্ছে দুলাল। তুমি সঠিক পথেই এগুচ্ছো। আমি কদিন থাকবো তোমার এখানে। তারপর আমাদের এলাকায় ফিরে যাব। তুমি বলছ তোমাদের পার্টি ভেঙে গেছে, নেতারা কেউ বাইরে নেই। আমাদের অবস্থা ঠিক একইরকম। তাতে কি আমরা কাজ থেকে পালিয়ে গিয়ে দূরে বসে-বসে হতাশ হবো?

দুলালদা আর বড়দা তাঁদের কাজের বিষয় নিয়ে বহুক্ষণ আলোচনা করলেন। কমিউনিষ্ট পার্টির কাজ সম্পর্কে আমার কোনো সঠিক ধারণা ছিলো না। তবু মনে হলো আমি যেন বড়দাদের দলেরই একজন। শুধু আমি নই, টেবিলে আমরা যারা বসেছিলাম, তখন আমরা সবাই ভাবছিলাম দেশে একটা পরিবর্তন আসুক, যাতে দেশের কোনো মানুষকে না-খেয়ে মরতে না হয়, আমাদের মতো ছেলেরা সবাই যেন স্কুলে যেতে পারে আর দারুভূইর মতো মানুষদের যেন বুড়ো বয়সে এভাবে কারো চাকরি করতে না হয়।

বড়দা আর দুলালদা মানুষের অবস্থা ভালো করার জন্যেই কাজ করছেন। তাঁদের জন্যে ছোট্ট সোনিয়া ভাবে, আমাদের বুড়ো দিদাও ভাবেন— আমরা সবাই ভাবি। তাঁদের জন্যে কিছু করতে পারলেই মনে হয় জীবনটা সার্থক হবে।

আমরা হারিয়ে যাওয়া ঠিকানা খুঁজছিলাম। আমি ভাবছি দুলালদা আর বড়দার মতো কি কখনো আমরা এভাবে দেশের অগণিত খেটে-খাওয়া মানুষের ভেতর হারিয়ে যেতে পারবো?

সেদিন থেকে দিদা মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরে পুরোনো জামাকাপড় জোগাড় করা শুরু করলেন। বাড়িতে মেজদার স্যুটিং-এর লোকেরা দিদার কাণ্ড-কারখানা দেখে দারুণ অবাক হয়ে গেলো। স্কুলের জন্যে নায়ক আব্বাস, কমেডিয়ান আলতামাস, নায়িকা উর্মিলাদি থেকে শুরু করে মেজদার পুঁচকে এ্যাসিস্টেন্টটিও টাকা দিলো। আমরা তিন জন আমাদের স্কলারশিপের পুরো টাকাটাই দিদাকে দিয়ে দিলাম— হারিয়ে যাওয়ার সময় সঙ্গে নেয়ার জন্যে এতদিন ধরে যে টাকা যখের ধনের মতো আগলে রেখেছিলাম। আমাদের মা-কাকিমারা অবশ্য বললেন, দিদা নাকি সব কাজেই বাড়াবাড়ি করেন। আমাদের মনে হলো এতবড় একটা কাজে হাত দিয়েছি আমরা, বাড়াবাড়ি তো হবেই। এটা তো আর কাকিমাদের রুমালে ফুলতোলার মতো সাধারণ কাজ নয়। এ কথাটা দুলালদা আমাদের বলেছিলেন।

একদিনেই দিদা প্রায় তিনশ জামাকাপড় জোগাড় করলেন। দিদা ছোটদের কাপড় বেশি করে চেয়ে নিচ্ছিলেন। রাতে সব কাপড় হাসি খালাদের বাড়িতে জড়ো করা হলো। ঠিক হলো পরদিন সকালেই বড়দা দুলালদা, রামু বিজু, দারুভূই আর আমি যাবো খাসিয়াদের গ্রামে। দারুভূই বলছিলো, ঝড়ে নাকি ওদের ঘরবাড়ি সব ভেঙে গেছে।

ভোরে আমরা ছ'জন পিঠে কাপড়ের বোঝা নিয়ে খাসিয়াদের গ্রামে গেলাম। পাহাড়ের ওপর মাচার মতো ঘর বেঁধে থাকে ওরা। আমরা গ্রামে যেতেই সবাই দুলালদাকে ঘিরে ধরলো। দারুভূই আর দুলালদা ওদের সঙ্গে কথা বললেন। আমরা কিছুই বুঝলাম না। বড়দা ঘুরে ঘুরে সব দেখছিলেন।

কাপড় পেয়ে ওরা ভারি খুশি। বাচ্চারা খালি গায়ে আগুনের ধারে বসেছিলো। চীনা পুতুলের মতো নিষ্পাপ বাচ্চাদের কষ্ট দেখে আমার প্রায় কান্না এসে গিয়েছিলো। রামু-বিজুর অবস্থাও দেখলাম একইরকম। আমাদের ইচ্ছে হলো দুলালদার মতো ওদের সঙ্গে থেকে যাই। দুলালদা বললেন, 'ওদের জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না আবু? অথচ ওরা জানে না ওরাও আমাদের মতো ভালো থাকতে পারে। ভালো খাবার, ভালো কাপড়—সবই পেতে পারে। এরা কষ্ট করছে বলেই কিছু মানুষ বিলাসিতা করতে পারছে। এরা সংখ্যায় অনেক বেশি, তবু কষ্ট করে, কারণ ওরা জানে না কিছু লোক কীভাবে ওদের বঞ্চিত করছে।'

সেদিন আমরা সন্ধ্যে পর্যন্ত খাসিয়াদের গ্রামে ছিলাম। গ্রামের যে ঘরগুলো পড়ে গিয়েছিলো, সেগুলো তোলার কাজে ওদের সাহায্য করলাম। দুলালদা বললেন, 'ওদের ঘরগুলো তোলা শেষ হলে কাল-পরশু আমরা ইশকুলের জন্য ঘর তুলবো।'

ঘর তুলতে গিয়ে সেদিনই একটা গণ্ডগোল হয়ে গেলো। আমাদের গ্রামে আসার আগে কয়েকজন গরিব চাষী মহাজনের কাছে গিয়েছিলো, বনে বাঁশ কাটার অনুমতি নেয়ার জন্যে। মহাজন লামা সিনতেং বলেছে বিনে পয়সায় কাউকে বাঁশ দেবে না। দুলালদা শুনে বললেন, 'বন কি মহাজনের নাকি! বন তৈরি করেছেন উব্লাউ নাংথাউ অর্থাৎ ঈশ্বর। লামার সিনতেং কি নিজেকে ঈশ্বর মনে করে?' একজন বললো, 'এতদিন বনে কাঠ কাটতে গেলে লামার অনুমতি লাগতো।' দুলালদা বললেন, 'লামা তোমাদের ঠকাতো। ও যে একটা পাজির হদ্দ, এ কথা তো তোমরা সবাই জানো। দেবতার বনকে ও নিজের বন বলতে পারে না।' শুনে কয়েকজন বললো, 'তাইতো, ঈশ্বরের পৃথিবীতে সবাই সমান। ঈশ্বরের বনে কারো অধিকার নেই। আমরা কাঠ কেটে উ ব্লাউ নাংথাউর পুজো দেবো, তাতেই ঈশ্বর খুশি হবেন।

দারুভূই ওদের সবকথা আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলো। 'ঈশ্বরের জয় হোক', বলে সবাই ধারালো কুড়োল আর দা হাতে বাঁশ কাটতে বনে চলে গেল। দুলালদাও ওদের সঙ্গে গেলেন। আমরা ঘর বাঁধার কাজ করছিলাম। দারুভূই অবশ্য আমাদের প্রথম বাধা দিয়েছিল। ওকে অনেক বুঝিয়ে শান্ত করেছি।

দুলালদারা দুপুরের দিকে বাঁশ কেটে ফিরলেন। দুলালদার সঙ্গীরা দেখলাম দারুণ উত্তেজিত গলায় কী যেন বলাবলি করছে। দুলালদা দারুভূইকে বললেন, 'মহাজনের লোকেরা বাধা দিতে এসেছিলো। প্রথমে আমরা ওদের শান্তভাবে বুঝিয়েছি। পরে যখন বেশি হম্বিতম্বি করতে শুরু করলো, তখন কয়েকজন দা হাতে করে ওদের দিকে তেড়ে গেলো। ব্যস, তখনি সব কটা চোখের পলকে হাওয়া।'

বড়দা হেসে বললেন, 'শ্রেণীসংগ্রাম তাহলে শুরু হয়ে গেছে দুলাল।'

দুলালদা বললেন, 'ওদের ভেতর কয়েকটা ছেলে পেয়েছি বড়দা, একেবারে হিরের টুকরো। খুব শিগগিরই ওদের হাতে গোটা এলাকার কাজ ছেড়ে দিতে পারব।'

সন্ধ্যে পর্যন্ত প্রায় সব কটা ঘর বানানো শেষ হয়ে গেলো। আমরা কচি ছাগলের ঝলসানো মাংস দিয়ে যবের রুটি খেয়েছিলাম। এদের এখানে ধান, যব, ভুট্টা, সবই হয়। পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ির মতো থাক কেটে ভুট্টা আর যবের চাষ করে। এখনো এদের অর্ধেক ফসল লামা সিনতেং-এর গোলায় দিয়ে আসতে হয়। কারণ এসব জমির মালিক নাকি সে। দুলালদা বললেন, 'সামনের বার ফসল নিতে লামা বেচারার একটু কষ্ট হবে। এরা বলছে লামাকে ওরা তিনভাগের একভাগ ফসল দেবে, তাও যদি ফসল ভালো হয়।'

সূর্য যখন দূরের খাসিয়া পাহাড়ের আড়ালে ডুবে গেলো তখন বড়দা বললেন, 'রামু , আবু, বিজু— তোমরা এবার দারুভূইকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। আমি

আর দুলাল এখানে থাকবো। এরা বলছে রাতে লামা সিনতেং গণ্ডগোল করতে পারে।'

দারুভূই বললো, 'গণ্ডগোল আর কি, হয়তো চোরের মতো এসে কারো ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবে।'

আমি বললাম, 'হাসি খালা যদি আপনাদের কথা জিজ্ঞেস করেন তাহলে কী বলবো?'

দুলালদা বললেন, 'ওঁকে বলো দু'তিনদিন আমাদের এখানে থাকতে হবে। দিদা যদি আরো কিছু কাপড় যোগাড় করেন তাহলে দারুভূইকে নিয়ে তোমরা কাল সকালে চলে এসো। আমি চাই ইশকুল ঘরটা তোমরাই বানাবে।'

উত্তরদিক থেকে তখন হু হু করে শীতল বাতাস বইছে। মাঠের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে গ্রামের সবাই তার চারপাশে বসে গল্প করছে আর মদ খাচ্ছে। বড়দা আর দুলালদাও ওদের সঙ্গে বসে পড়েছেন। ওদের সকলের মুখে আগুনের লাল ছায়া কাঁপছে। দুলালদা বলছিলেন, 'একটা স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করতে পারে। গ্রামের বারুদের মতো মানুষগুলো যেভাবে উত্তপ্ত হচ্ছে, সারাদেশে দাবানল জ্বলে উঠতে আর বেশি দেরি নেই।'

পিয়াইন নদী পার হয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখলাম, দূরে পাহাড়ের বুকে একটুকরো স্ফুলিঙ্গ ধিকিধিকি জ্বলছে। মনে মনে ভাবলাম লামা সিনতেংরা কখনো এই আগুন নেভাতে পারবে না।

আমরা তিনজন বাড়ি ফেরার পথে হাসি খালাদের বাসায় গেলাম। দেখি দিদা বসে হাসি খালার সঙ্গে গল্প করছেন। এতদিন আমাদের ধারণা ছিলো দিদা হাসি খালাকে পছন্দ করেন না। অথচ ওঁরা দুজন একটা সোফায় পাশাপাশি বসে অন্তরঙ্গভাবে কথা বলছিলেন। দিদার সঙ্গে হাসি খালার এই অন্তরঙ্গতার যোগসূত্র যে দুলালদা একথা অনুমান করতে এতটুকু কষ্ট হলো না। রামু বলল, 'হাসি খালা, দুলালদা আর বড়দা দু'তিনদিন গ্রামে থাকবেন।'

হাসি খালা দিদাকে বললেন, 'আপনাকে বলিনি, দুলাল আজ ফিরবে না! কুটুকে পেয়ে ও এখন সব কিছু ভুলে যাবে।'

বিজু বলল, 'আজ কি কোনো কাপড় পেয়েছো দিদা?'

'অনেক!' দিদা বললেন, 'তোরা দুদিনেও নিতে পারবি না।'

রামু বললো, 'তার মানে আমরা কালও গ্রামে যাচ্ছি।'

সোনিয়া বললো, 'মা, কাল আমি আবুদের সঙ্গে যেতে চাই, অবশ্য তোমার যদি আপত্তি না থাকে।'

হাসি খালা হেসে বললেন, 'বেশ তো যেও।'

সোনিয়া গভীর কৃতজ্ঞতার চোখে হাসি খালা আর আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। আমি মৃদু হাসলাম। ওর দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললাম, সোনিয়া

আমি জানতাম, একদিন তুই ঠিকই দুলালদার বন্ধু দীপার মতো আমাদের সঙ্গে মিশে যাবি।

দিদা বললেন, 'যাই হাসি। অনেক গল্প করলাম। কাল আবার আসবো। তুমি বাছা নিজেকে এভাবে গুটিয়ে রেখো না। তোমার ঘাড়েই সমিতির সব কাজ চাপাবো।'

সোনিয়া আমাদের সঙ্গে গেট পর্যন্ত এসে প্রত্যেকের হাতে একটা করে তাজা গোলাপ গুঁজে দিলো। দিদা মিষ্টি হেসে বললেন, 'পাগল মেয়ে! কাল তোর জন্যে নারকোলের চিঁড়ে আনব।'

মেঘ কেটে গিয়ে আকাশে তখন রূপোর মতো চাঁদ উঠেছে। সারা আকাশ চাঁদের আলোয় ঝকঝক করছে। অল্প অল্প কুয়াশায় আমি, রামু আর বিজু-দিদাকে ঘিরে হাঁটছিলাম। আমাদের সবার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। আমি ভাবছিলাম, আমাদের একরত্তি শহর জাফলং-এ এসে দুলালদা এই তিনদিনে কী অঘটনই না ঘটিয়েছেন। বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো কতগুলো নিঃসঙ্গ মানুষের জীবনধারা তিনি উল্টোখাতে বইয়ে দিয়েছেন। হাসি খালা এখন দিদার সঙ্গে পাশাপাশি বসে হেসে গল্প করেন। আমি জানি সোনিয়া এখন আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। আসলে একটি মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা সবাই একই লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি। আমি গর্ব বোধ করলাম শেষ পর্যন্ত বাবাও আমাদের মিছিলের একজন হয়ে গেলেন। বাবাকে এখন মোটেই দূরের কেউ মনে হচ্ছে না। বড়দা আর দুলালদাদের মতো মানুষরা আছেন বলেই অনেক দুঃখ আর যন্ত্রণার ভেতর নতুন ভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখা যায়। স্কুলে যখন রচনা লিখতে হতো, বড় হলে তুমি কী হতে চাও— এতদিন কি আবোল-তাবোল কথাই না লিখতাম!

রামু একসময় বললো, 'মাত্র তিনদিনে কত কিছু ঘটে গেলো।'

আমি বললাম, 'হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা খুঁজে পেয়েছিস রামু?'

রামু মৃদু হেসে বললো, 'আমি চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছি আবু। আমি জানি তুইও তাই ভাবছিস।'

আমি রামুর কাঁধে হাত রাখলাম। জয়ন্তিয়া পাহাড়ে দুলালদা আর তাঁর বিপ্লবী সঙ্গীদের কথা ভাবলাম। এখন ওঁরা আগুনের চারপাশে বসে পুরোনো সমাজটাকে ভেঙে নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখছেন, আর আগামী দিনের কাজের পরিকল্পনা করছেন। দুলালদা হয়তো দীপার কথা ভাবছেন। সোনিয়া কি এখন আমার কথা ভাবছে?

আমি বুক ভরে সোনিয়ার দেয়া শিশির-ভেজা লাল গোলাপের গন্ধ নিলাম।